এপ্রিল ২০২২ ■ চৈত্র ১৪২৮-বৈশাখ ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

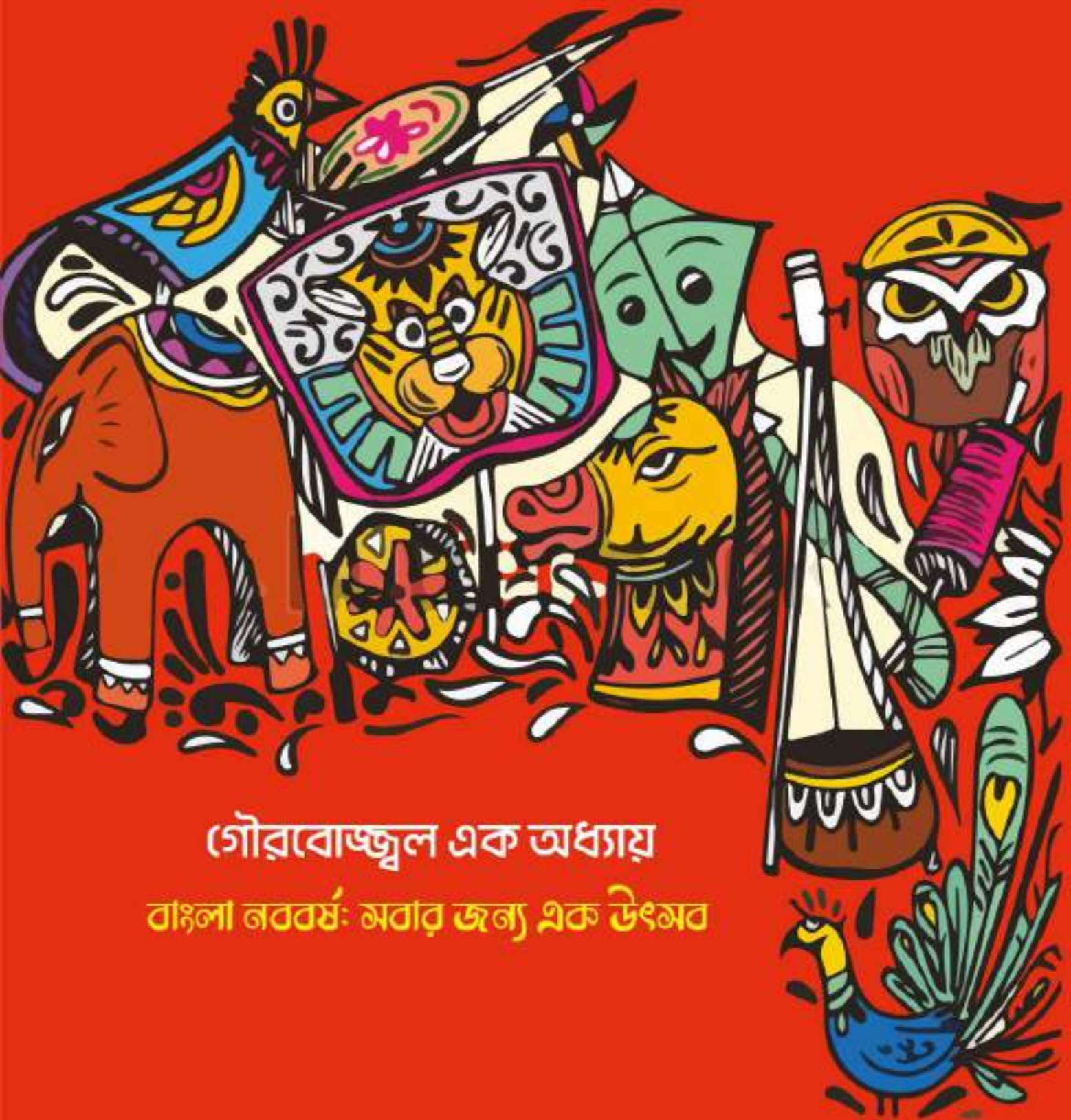

গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়

বাংলা নববর্ষ: সবার জন্য এক উৎসব

রাফান ইবনে মেহেদী, ৫ম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

এস এম আব্দুল্লাহ, ৩য় শ্রেণি, উইলস লিটল স্কুল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, শুভ নববর্ষ। এসে গেছে বাংলা নববর্ষ ১৪২৯। পুরাতন বছরকে ফেলে শুরু হবে নতুন বছরের পথচলা। তোমাদের জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। দুই বছর পর নববর্ষ বরণ করে নেওয়ার মহোৎসব হলো মঙ্গল শোভাযাত্রায়। এবারের প্রতিপাদ্য, 'নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে'।

আমরা বাঙালি। আমাদের আছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। পহেলা বৈশাখের দিনে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশা নিয়ে বাংলা নববর্ষকে বরণ করি। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রমনার বটমূলে দিনটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই দিন উপলক্ষ্যে গ্রামগঞ্জে, শহর-বন্দরে সকলে বিভিন্ন ধরনের নির্মল আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। তোমরাও নিশ্চয়ই আনন্দের সাথে দিনটি উদ্‌যাপন করো।

ছোট্ট বন্ধুরা, ২রা এপ্রিল ১৫তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য হলো- 'এমন বিশ্ব গড়ি, অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা বিকশিত করি'। অটিজম হচ্ছে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা। বিশেষজ্ঞরা একে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার বলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নেতৃত্বে অটিজম বিষয়ে গুরুত্ব ও সচেতনতা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বেড়েছে। বন্ধুরা, তোমরা পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব জায়গায় তাদের বিষয়ে সচেতন ও যত্নবান হবে।

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল। ১৭ই এপ্রিল এ সরকার শপথ গ্রহণ করেন। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি সেই ইতিহাসের বীর সেনাদের।

ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের জন্য শুভ কামনা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাহুদ আলম
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editormobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : প্রিয়াংকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৭৬/ই নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

নিবন্ধ

বাংলা নববর্ষ সবার জন্য এক উৎসব/সুজন বড়ুয়া ০৩
নববর্ষ ও বাংলা মাস/মোহাম্মদ আজহারুল হক ০৭
পহেলা বৈশাখ আদি ও অকৃত্রিম উৎসব/বিনয় দত্ত ১১
গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়/মো. সিরাজুল ইসলাম ১৮
পাহাড়িয়া ঐতিহ্যে পেদা টিং টিং/আরমান হোসেন চেওয়ান ৪১

গল্প

বৈশাখে আমরা/হাবিবা বেগম ০৯
স্মৃতি ঘেরা শৈশব ও বৈশাখ/হাসান ইকবাল ২৫
বৈশাখি মেলায়/রশিদ এনাম ২৮
শুভবোধ/মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন ৩০
লাল পাতার নৌকা/জহির টিয়া ৩৮
বিতুনি ও চুকুরি/মাহমুদা আকতার ৪৩
খুঁজে ফেরা/আনিস রহমান ৪৫

সাফল্য প্রতিবেদন

চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ১৭
জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালিত/মাহমুদা নিরা ৫২
গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশে জয়/জান্নাতে রোজী ৫৩
বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় বাগেরহাট/শাহানা আফরোজ ৫৪
খুদে শিক্ষার্থীর বড়ো সাফল্য/মেজবাউল হক ৫৭
বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস/মো. জামাল উদ্দিন ৫৮
অনলাইনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর/এস এম জামান ৫৯
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁখি ৬০
বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ ৬২

বড়োদের কবিতা

০৬ শাফিকুর রাহী
১৪ হাসান হাফিজ/বিপুল বড়ুয়া
১৫ পরিতোষ বাবলু/চন্দনকৃষ্ণপাল
১৬ মুহা. রাকিবুল ইসলাম/আবদুল লতিফ
৫১ মো. কামাল শেখ

ছোটোদের ছড়া

১০ রাকিব মনওয়ার/সাকিবুল ইসলাম
৫৬ রহমাতুল্লাহ আল আরাবী/আথির আলম
সিরাজ সালেহীন/রুপা আক্তার

রূপকথার গল্প

৩৪ রহস্যময়ী রাজকন্যারা/সাজেদ ফাতেমী

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : রাফান ইবনে মেহেদী/এস এম আব্দুল্লাহ
তৃতীয় প্রচ্ছদ : আফিফা মাইমুনা লাবিবা

৪০ আয়ান হক
৫১ সায়মা আদিবা আভা
৫৫ নামিরা জাহান
৬১ শান্তুমা খানম নিধী/মীর্জা মাহের আসেফ

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

বাংলা নববর্ষ : সবার জন্য এক উৎসব

সুজন বড়ুয়া

মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব কিছু ধর্মীয় উৎসব। ঈদ, দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বড়োদিন ইত্যাদি উৎসবের আমেজ বিরাজ করে বছর জুড়ে। বাঙালির ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও রয়েছে বেশকিছু ঋতুভিত্তিক উৎসব। যেমন- বাংলা নববর্ষ উৎসব, পিঠা উৎসব, নবান্ন উৎসব, বসন্ত উৎসব, ঘুড়ি উৎসব, ফল উৎসব ইত্যাদি। প্রাচীন এসব উৎসবের সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে স্বাধীনতা উৎসব, বিজয় উৎসব, গণিত উৎসব, সংগীত উৎসব, নাট্যোৎসব ইত্যাদি। প্রতিটি উৎসব-পার্বণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আনন্দময় অনুভূতি।

বাঙালির ঋতুভিত্তিক প্রধান উৎসবটির নাম পয়লা বৈশাখ–বাংলা নববর্ষ। নানা কারণে এই উৎসবটি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা বর্ষবরণ উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নতুন বাংলা বছর। কিন্তু চৈত্র শেষে বৈশাখ শুধু পঞ্জিকার কালপরিক্রমা নয়। বৈশাখের জন্য প্রকৃতিতেও চলে দীর্ঘ আয়োজন। প্রকৃতির তাপদগ্ধ নিদাঘ দিনে সমুদ্র হাওয়ায় ভেসে আসে মেঘ। গ্রীষ্মের দাবদাহে মাটিতে জাগে পিপাসা। মুকুল ঝরে যাওয়া আম গাছে, জাম গাছে, বট কিংবা খই-ডুমুরের নতুন পত্র-পল্লবের আড়ালে চাতক ডাকে 'ফটিক জল' বলে। প্রায় প্রতিদিন চলতে থাকে মেঘাক্রান্ত বিকেলের গল্প। মাঝে মাঝে দিগন্তের ওপার থেকে বৃষ্টির সুঘ্রাণ আসে। শুরু হয় আবাদের আয়োজন। নতুন দিন আনে নতুন ফসল বোনার স্বপ্ন।

আসলে বৈশাখের প্রথম দিন শুধু একটি নববর্ষের দিন নয়, বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এ দিনটির সঙ্গে বাঙালির আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ দিন ব্যবসায়ীরা হিসাব-নিকাশের জন্য নতুন হালখাতা খোলে। শুরু হয় ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড। তাই সামগ্রিক মঙ্গল কামনায় মিষ্টিমুখ করানো হয় সবাইকে।

বাঙালি জাতি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ পালন করে থাকে। বর্ষবরণের উৎসব শহর-গ্রাম সবখানে হয় সমান সমারোহে। নানা ধরনের মেলা বসে ঘাটে মাঠে, দিকে দিকে। তখন সমগ্র জাতি যেন জেগে ওঠে মেলা-উৎসবে। তাক ডুমাডুম ঢোলের বাজনা, নাগরদোলা, সার্কাস, পুতুলনাচ, বলিখেলা, ষাঁড়ের লড়াই, যাত্রাপালা,

বায়োস্কোপ, রঙ-বেরঙের খেলনার দোকান, মণ্ডা-মিঠাই আর নানারকম আয়োজনে মেলা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে ওঠে হৈ-হুল্লোড়ে। নতুন আশা আর আশ্বাসে আপন করে নেয় নতুন বাংলা বছরকে।

বাংলা নববর্ষ উৎসব আবহমান বাংলার লোক সংস্কৃতির অংশ। অবশ্য এখন বাংলাদেশের নগর জীবনেও এর প্রবল প্রভাব দৃশ্যমান। রাজধানী ঢাকায় বর্ষবরণের আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে পড়ে মানুষ। এ দিন রাতের প্রথম প্রহরে বিখ্যাত রমনা পার্কের বটমূলে অনুষ্ঠানের সূচনা করে ছায়ানট। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে ছায়ানটের শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর সংগীত –'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...।'

বর্ষবরণের এ বাণী যেন রাজধানী থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। দেশের মানুষ পুরনো বছরের জীর্ণ জরা গ্লানি মুছে ফেলে জেগে ওঠে নতুন বছরকে বরণ করার আনন্দে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের আগে থেকে চলে আসছে এই ধারা। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট' বিপুল উদ্দীপনায় প্রথম রমনার বটমূলে পয়লা বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে নববর্ষ উদযাপন শুরু করে, সেই ঐতিহ্যবাহী ধারা এখনো অব্যাহত। গত শতকের আশির দশকের শেষলগ্নে স্বৈরশাসক এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছলে ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বাঙালি জাতির প্রতি অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' নামে বিজয়, সাহস ও শান্তির প্রতীক হিসেবে শৈল্পিক উপস্থাপনায় অভূপূর্ব এক শোভাযাত্রা সূচনা করে। সেই থেকে নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে এই শোভাযাত্রা। ২০১৬ সালে ইউনেস্কো এ মঙ্গল শোভাযাত্রাকে নির্বস্তুক সাংস্কৃতি ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage) বলে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।

প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের এই আয়োজন বাংলা নববর্ষ উৎসব পালনকে করে তোলে আরো বর্ণাঢ্য। আবহমান বাংলার লোক সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে বর্ণিল করে উপস্থাপন করা হয় শোভাযাত্রায়। চারুকলা অনুষদের শিল্পীরা বাংলার রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হাতি, হরিণ, পেঁচাকে মূর্ত করে তোলেন বেত, বাঁশ কাগজ ও রঙের কারুকাজে। এ কাজে তরুণ-নবীন ছাত্রদের সঙ্গে থাকেন নবীন-প্রবীণ শিক্ষকরাও। নববর্ষের আগে দীর্ঘদিন চলে এর প্রস্তুতি। নববর্ষের দিন চারুকলা অনুষদ থেকে বের হয়ে এ মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রদক্ষিণ করে পুরো রমনা এলাকা। মঙ্গল শোভাযাত্রার এই আয়োজন ছাড়া এখন বাংলা নববর্ষ পালন যেন কল্পনাই করা যায় না। নববর্ষের দিন পুরো রমনা এলাকা থাকে লোকে লোকারণ্য। মেলা-উৎসবে মানুষ মাতোয়ারা। রঙিন শাড়ি-পাঞ্জাবিতে বাঙালি সাজা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পান্তা-ইলিশ খেয়ে উপভোগ করে নতুন আনন্দ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, রমনা লেকের ধার ও পার্কের এ দৃশ্য কত মনোরম না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুধু পয়লা বৈশাখেই হয় না। বিদায়ী বাংলা বছরের শেষ দুই দিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে এই উৎসব পালিত হয়। পার্বত্য জেলাগুলোর আদিবাসীরাও বাংলা নববর্ষ পালনের উৎসবে শরিক হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এই উৎসব উদযাপিত হয় অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে। চাকমাদের কাছে এই উৎসব বিজু নামে পরিচিত। এটি তাদের সামাজিক উৎসব। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধরা এ উৎসব পালন করে বিউ নামে। এটি তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব। চাকমারা বাংলা বছরের শেষ দিন 'মূল বিজু', তার আগের দিন 'ফুল বিজু' এবং তারপর বছরের প্রথম দিনকে 'গোজ্যেপোজ্যে' বলে। ফুল বিজুর দিন শিশুরা নদীজলে কলাপাতায় ফুল ভাসিয়ে দেয় ও ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। মূল বিজুর দিন প্রতিটি বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন করা হয়। এতে বিভিন্ন তরকারি দিয়ে নিরামিষ রান্না হয়, তাকে স্থানীয় ভাষায় 'পাঁচন' বলে। ওই পাঁচনে তেতো ও মিষ্টিসহ সব রকম স্বাদের আনাজ মেশানো থাকে। চাকমাদের বিশ্বাস, বছরের শেষ দিন তেতো, মিঠে সব রকম স্বাদের

খাবার খেয়ে বর্ষ বিদায় করা ভালো। এই দিন তরুণীরা বয়স্কদের জন্য নদী থেকে পানি তোলে। সেই জলে তাঁদের স্নান করিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। সদ্য বিবাহিতরা বর-কনেসহ বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যায়। ছোটো ছেলেমেয়েরা ভিটেয় খৈ, চাল, ধান, ভাত ইত্যাদি পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের জন্য ছিটিয়ে দেয়। নববর্ষের দিন বৌদ্ধবিহারে গিয়ে ফুল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধপূজা করে বৌদ্ধরা। মারমা, রাখাইন, ত্রিপুরা, চাক, খ্যাং, খুমি, লুসাই, পাংখো, বোম প্রভৃতি আদিবাসী জনসাধারণ নিজেদের মতো এই উৎসব পালন করে। প্রত্যেক আদিবাসীর মধ্যে এই উৎসব নিয়ে গান ও নাচ আছে। মারমা ও রাখাইন যুবক-যুবতীরা এই দিনে জল ছিটানো উৎসব করে।

পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ধারাটির প্রচলন ঘটে অনেক রদবদলের মধ্য দিয়ে। এখন বৈশাখ থেকে বাংলা মাস গণনা করা হলেও আগে তা ছিল না। কারণ বারোটা বাংলা মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসের অর্থ হলো প্রথম। সম্ভবত, পয়লা বৈশাখ থেকে বাংলা বছর চালু করার আগ পর্যন্ত অগ্রহায়ণকে প্রথম মাস ধরা হতো। তার আরো একটা কারণ ছিল। অগ্রহায়ণ হলো ধান কাটার মাস, বাংলার ঘরে ঘরে তখন নতুন ফসল ওঠে। এ জন্য আগে একে বলা হতো 'ফসলি বছর' বা ফসল কাটার বছর।

বাংলা সন চালুর আগে এ দেশের রাজকার্যে হিজরি অব্দ ব্যবহৃত হতো। এ গণনার উৎস চন্দ্র। ফলে হিজরি অব্দ ৩৫৪ দিনে পূর্ণ হয়। এ কারণে বছরের আরম্ভ একেক বছরে হয় একেক দিনে। এগারো দিনের ব্যবধান থাকে চন্দ্র আর সৌর বছরে। এতে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রাজকাজে অসুবিধা দেখা দেয়। তাই মাঝখানে আবার অধিমাসের প্রবর্তন করা হয়েছিল। তারপর সম্রাট আকবরের সময় বছর গণনাকে বঙ্গাব্দে বা বাংলা সনে পরিবর্তিত করা হয়। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হিজরি অব্দ ৯৬৩-এর সঙ্গে পরবর্তী সৌর বছর সংখ্যা যোগ করে বাংলা সন করা হয়েছে। আগের যেসব অসুবিধার জন্য সৌর আর চন্দ্র হিসেবে অসমন্বয় হতো তা দূর করা হলো একই সঙ্গে দুটোকে মিলিয়ে নিয়ে। এখন বর্ষ শুরু হয় বৈশাখে– এ নিয়ে আর বিতর্ক নেই।

বাংলাদেশ ছাড়াও উত্তর ভারত থেকে আসাম, ত্রিপুরা, মায়ানমার থেকে থাইল্যান্ড পর্যন্ত বাংলা নববর্ষ উৎসব অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়। আসামে এই উৎসব ৭ দিন ধরে চলে এবং আসামে বিজু সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব।

বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। বৈশাখ আনে উত্তাপ বা নিদাঘ আবহাওয়া। আনে কালবৈশাখি। আনে গাছে গাছে থোকা থোকা ফলের সমারোহ। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজ, ফুটি, লটকন, বেল, বিলিম্বি আরো কত ফল। ফলের মৌসুমই এটি। নানা ফলের গন্ধে ভরিয়ে দেয় মন। সেই সাথে আছে কৃষ্ণচূড়া, জারুল, সোনালু, জুঁই, চাঁপা, টগর, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ ইত্যাদি ফুলের মন মাতানো রূপ ও সৌরভ। চৈত্র থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রকৃতির এই সব রঙিন রসালো আয়োজন। ফলে বাংলা নববর্ষ উদযাপন হয়ে ওঠে আরো প্রাণময় উজ্জ্বল।

বাংলাদেশ অনেক ধর্ম বর্ণ গোত্র সম্প্রদায়ের মানুষের প্রিয় আবাসভূমি। এখানকার সাগর পাহাড় ঘেঁষা উদার প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে অসীম সহনশীলতা ও ধৈর্য। এখানকার মানুষ ধর্ম পালন করে যে যার মতো। কিন্তু উৎসব পালন করে সবাই মিলে। বাংলা নববর্ষ তেমনি একটি উৎসব যে উৎসবের আনন্দে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এ দেশের সব মানুষ মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এটি কোনো বিশেষ ধর্ম বা গোত্রের উৎসব নয়, এটি আপামর বাঙালির উৎসব, এটি সবার উৎসব। তাই এদিনটির মহিমা একেবারে আলাদা, সম্পূর্ণ অন্যরকম। সবাইকে শুভময় নববর্ষ ১৪২৯। ■

শিশু সাহিত্যিক ও সাবেক উপপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

পহেলা বৈশাখ

শাফিকুর রাহী

আজ সারাদিন স্বাধীন সুখে নাচবো আমি গাইবো,
মহানন্দে হারিয়ে যাবো সুখের তরী বাইবো।
নাগরদোলায় হাওয়ায় হাওয়ায় খুশির সীমা নাই,
ছোটো-বড়ো সবাই মিলে একতালে গান গাই।
চতুর্দিকে কী আনন্দ উল্লোসিত মন
ঢোল তবলা জারি-সারি চলছে সারাক্ষণ।
কাবাডি আর গোল্লাছুটে দুষ্টুদের হইচই,
বুবুর হাতে রাঙা বালা বিন্নিধানের খই।
দূর আকাশে ঘুড়ির নাচন আনন্দ উৎসবে,
নাচে-গানে পান্তা-ভাতে উঠল মেতে সবে।
দমকা হাওয়ার মহা-দাপট নদ-নদী উত্তাল,
পাগলা ঝড়ের তোড়ে ভাঙে নায়ের রঙিন পাল।
কবিগুরু দুখুমিয়া হাছন-লালন সাঁই,
প্রাজ্ঞ-জ্ঞানীর গুণ-মহিমা এসো সবাই গাই।
বাংলা মায়ের রূপ-লাবণ্য নকশি কারুকাজে,
লাল-সবুজের পাপড়ি আঁকা নীলাম্বরীর ভাঁজে।
মাল্লা-মাঝির ভাটিয়ালি সুখের পানসি নায়
এক তারাতে উদাস বাউল মনের সুখে গায়।
ঝিঁঝি পোকা বাজায় বাঁশি হাওয়ার তালে তালে,
ঝুমুর ঝুমুর শব্দে নুপুর বাজে টিনের চালে।
হলুদ শাড়ি পিন্দে পরি- নাচে বৃক্ষ শাখে,
হাটে-মাঠে হরেক মেলা পহেলা বৈশাখে।

নববর্ষ ও বাংলা মাস

মোহাম্মদ আজহারুল হক

বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখে পালন করা হয়। পহেলা বৈশাখ উদযাপন বাঙালির সর্বজনীন লোক উৎসব। সম্রাট আকবরের আমল হতে এদেশে নববর্ষ পালন হয়ে আসছে। এ সময় খাজনা আদায়ের জন্য হালখাতা খোলায় এটা সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে পহেলা বৈশাখ গ্রাম ও শহরে পালন হয়ে থাকে। তবে পালনের ব্যাপ্তিতে কিছুটা ভিন্নতা আছে।

নববর্ষে গ্রামে গ্রামে মেলা বসে। মেলায় বানর নাচ, পুতুল খেলা, সার্কাস, বায়োস্কোপ দেখানো হয়। মেলা উপলক্ষ্যে হাডুডু, নৌকা বাইচ, নানারকম খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। হরেক রকম মিষ্টান্ন, মাটির খেলনা, চুড়ি ফিতা, খই, বাতাসা, কাঠের জিনিসপত্র, কৃষিজ উপকরণ, দাও, বটি, ছুরি ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র মেলায় পাওয়া যায়।

শহরে পহেলা বৈশাখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা র‍্যালি বের হয়। হালখাতার অনুষ্ঠান শহরে ও গ্রামে সব জায়গায় হয়। সবাই রং-বেরঙের পোশাক পরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যায়। পুরনো বছরের দেনা- পাওনা চুকিয়ে নতুন হিসাব খোলার মাধ্যমে হালখাতা করা হয়। এ সময় মিষ্টি বিতরণের রেওয়াজ আছে। নববর্ষ পালনে দেশের জমজমাট আয়োজন হয় রাজধানী ঢাকায়। রমনার বটমূলে ছায়ানটের উদ্যোগে 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গান দিয়ে বর্ষবরণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের মঙ্গল শোভাযাত্রা নববর্ষের উৎসবকে আরো বর্ণিল করে।

তবে দুঃখের বিষয় হলো যারা বৈশাখের উৎসবে অংশগ্রহণ করে তাদের অনেকেই জানে না এদেশে বঙ্গাব্দ কত সন চলছে। বাংলা মাস কয়টি, এদের নাম কী। ষড়ঋতুর নাম পর্যন্ত সঠিকভাবে বলতে পারে না অনেকে। বাংলা কোন মাস কত দিনের সেটা বলার লোক পাওয়া মুশকিল। তবে গ্রামীণ সমাজে বাংলা মাস অনুযায়ী কৃষিকাজ ও কিছু পারিবারিক বিষয় পরিচালনা হয়ে থাকে। তারা এখনো বাংলা মাসের খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেকটা অবহিত।

বঙ্গাব্দ: মুসলিম শাসনামলে রাজকার্যাদি হিজরি অব্দ গণনার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। চান্দ্র বছর ৩৫৪ দিনে হতো বিধায় পরবর্তী বছর একই দিনে হতো না, এতে রাজস্ব আদায় ব্যাহত হতো। তাই সম্রাট আকবরের আমলে ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হিজরি অব্দ ৯৬৩ এর সাথে পরবর্তী সৌর বছর সংখ্যা যোগ করে বাংলা সন গণনা শুরু হয়।

৪৬৬ (২০২২-১৫৫৬) বছর পরে বর্তমানে বঙ্গাব্দ সন ১৪২৯ (৯৬৩+৪৬৬)। তখন হিজরি সালের মুহররম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস। এজন্য বৈশাখ মাসকে বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস বলা হয়।

বাংলা মাস: বঙ্গাব্দে মোট বারো মাস। মূলত প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্র সুরিয়া মতে নক্ষত্রের নামানুসারে বাংলা মাসের নামগুলো নেওয়া হয়েছে।

মাসের নাম	নক্ষত্র
বৈশাখ	বিশাখা
জ্যৈষ্ঠ	জেষ্ঠা
আষাঢ়	অষধা
শ্রাবণ	শ্রবণা
ভাদ্র	ভদ্রা
আশ্বিন	অশ্বিনী
কার্তিক	কৃত্তিকা
অগ্রহায়ণ	মৃগশিরা
পৌষ	পুষ্যা
মাঘ	মঘা
ফাল্গুন	ফাল্গুনী
চৈত্র	চিত্রা

ঋতু: মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এদেশে ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের তারতম্যে ঋতুগুলো একটি হতে আরেকটি পৃথক হয়। আমাদের দেশে ঋতু ৬টি। প্রতিটি ঋতুর সময় কাল দু'মাস। একেক ঋতু প্রকৃতির উপর একেক ধরনের প্রভাব ফেলে।

থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মিয়ানমারও তাদের নববর্ষ গণনা করে ১৪ই এপ্রিল হতে। আমাদের দেশেও একই তারিখ হতে নববর্ষ গণনা করা হয়। আমাদের দেশে বাংলা প্রতিটি মাসে ইংরেজি দু'টি মাস এসে পরে।

ছয়টি ঋতুতে বাংলা ও ইংরেজি মাসগুলো কীভাবে আসে তা নিচে দেওয়া হলো-

বাংলা মাস	ইংরেজি মাস	ঋতু
বৈশাখ	এপ্রিল -মে	গ্রীষ্ম
জ্যৈষ্ঠ	মে-জুন	
আষাঢ়	জুন-জুলাই	বর্ষা
শ্রাবণ	জুলাই-আগস্ট	
ভাদ্র	আগস্ট- সেপ্টেম্বর	শরৎ
আশ্বিন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	
কার্তিক	অক্টোবর -নভেম্বর	হেমন্ত
অগ্রহায়ণ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	
পৌষ	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	শীত
মাঘ	জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি	
ফাল্গুন	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	বসন্ত
চৈত্র	মার্চ-এপ্রিল	

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশে নতুন বর্ষপঞ্জি মোতাবেক বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ৩১ দিনের। ফাল্গুন মাস ছাড়া বাকি পাঁচ মাস ৩০ দিনের। ফাল্গুন মাস ২৯ দিনের, কেবল গ্রেগরিয়ান লিপ ইয়ারের বছর ফাল্গুন মাস হবে ৩০ দিনের।

বাঙালি হিসেবে আমরা বাংলা নববর্ষ উৎসাহের সাথে পালন করব। তবে, বঙ্গাব্দ ও সবগুলো বাংলা মাস এবং ঋতু সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হবে। হাজার বছরের কৃষ্টি ধারাকে জানার এবং লালনপালনের মাধ্যমেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এভাবেই জাতি হিসেবে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি।■

সাবেক অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

বৈশাখে আমরা

হাবিবা বেগম

চৈত্রের ৩০ তারিখে নদী মাকে বলে খুব ত্বরিতগতিতে ছোটো ভাই উৎসকে নিয়ে বাহাদুর বাজারে গিয়ে লাল-সাদা রংয়ের কয়েকটি মাটির থালা, কয়েকটি নতুন জামা আর লাল চুরি কিনে বাড়িতে আসে।

নদীর মা জিজ্ঞেস করল, নদী এগুলো কী করবে?

মা তুমি জানো না? বাবাকে ইলিশ মাছ কিনতে বলেছি। তুমি অনেকগুলো পান্তাভাত বানাবে।

কী করবে এতগুলো পান্তাভাত দিয়ে?

মা আমি এবার ঠিক করেছি আমাদের পাশের গুচ্ছগ্রামের ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে পহেলা বৈশাখের উৎসব পালন করব। আমাদের মতো করে উৎসব পালন করা তো ওদের সাধ্যের বাইরে। এটা দেখে আমার খুব খারাপ লাগে, তাই ভাইসহ আমি এটা ভেবেছি। তুমি কি রাগ করেছ মা?

ধুর পাগলি। রাগ করব কেন, খুব খুশি হয়েছি।

আজ নববর্ষ। নদী ভাইকে পাঠিয়েছে সুমি, মিনা, গীতা, সুমনসহ সবাইকে ডেকে আনতে। ওরা সবাই বাড়ির পাশের সোনাচালুনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে যাবে। ওখানেই ওরা আজ কিছুক্ষণ আনন্দ করবে তারপর বাজারের সংলগ্ন মাঠে দুপুরের পর মেলা বসবে সেখানে যাবে।

সবাই নতুন পোশাক, চুরি, টিপ আর ছেলেরা লাল-সাদা রঙের ফতুয়া পরে ভীষণ খুশি। তাদের মন আজ ভালোবাসায় নদীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখতে চায়। নদী এক এক করে সকলের গালে, কপালে বাংলাদেশের মানচিত্র, ঘুড়ি, কুলা এঁকে দিচ্ছে আর আঁকতে আঁকতে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে, আমরা পহেলা বৈশাখের উৎসব পালন করি এটা কখন থেকে শুরু হয়েছে তোমরা বলতে পারো?

না আপু।

তাহলে শোনো সংক্ষিপ্তভাবে বলছি-

বাংলা নববর্ষের উদ্ভব হয় ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর। তখন সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে

কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করতেন। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল বিধায় কৃষি ফলনের সাথে মিলত না এবং খাজনা আদায়ে বিঘ্ন ঘটত। তাই ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জি প্রচলন করেন। ৯৬৩ হিজরি সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। কারণ সেটা ছিল মুহররম মাস এবং বাংলায় বৈশাখ মাস। এজন্য বৈশাখ মাসকে বাংলা বর্ষপঞ্জিকার প্রথম মাস এবং প্রথম দিনকে নববর্ষ ধরা হয়। তখন নববর্ষে বিভিন্ন আয়োজন করা হতো। সকল ধর্ম, বর্ণের মানুষ সাম্প্রদায়িকতা ভুলে এক কাতারে দাঁড়িয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানাতো।

কি এবার বুঝলে তো?

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বলে, হ্যাঁ আপু।

আপু ইলিশ-পান্তা অনেক বছর পর খেলাম। খুব মজা পেলাম আপু, তুমি খুব ভালো। আমাদের বাবারা তো ইলিশ মাছ কোনোদিন কিনতেই পারে না। ঠিক আছে। তোমরা পড়াশোনা করে অনেক বড়ো হও, তখন কিনবে। পড়াশোনা কিন্তু ছেড়ো না। এবার চলো দেখি মেলায় যাই। না হলে রাত হয়ে যাবে। রাতে বাইরে থাকা ঠিক নয়।

নদী ওদেরকে নাগরদোলায় চড়ায়, পতুল নাচ দেখায়, একটি করে বাঁশি ও হাওয়াই মিঠাই কিনে দেয়। ওদের মুখগুলো যেন পূর্ণিমা চাঁদের মতো ঝলমল করছিল। সেটা দেখে নদীর বুক আনন্দে ভরে যায়, অন্যদিকে তার চোখ থেকে পানি ঝরছিল। ■

কবি ও প্রাবন্ধিক

এগিয়ে যাব

রাকিব মনওয়ার

চৈতালি শেষে বৈশাখ আসে
ঈশানকোণে কালো মেঘ ভাসে
রোদ্দুরে চৌচির মাঠঘাট
তবু জমজমাট মেলা-হাট।

ঐতিহ্যে আর উৎসবের হালখাতা
সাথে আছে মঙ্গল শোভাযাত্রা।
পুরনো সব গ্লানি ভুলে গিয়ে
এগিয়ে যাব সবাইকে নিয়ে।

১০ম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল, বাসাবো শাখা

বৈশাখি মেলা

সাকিবুল ইসলাম

নানানরকম খেলনা মেলে
বৈশাখি মেলাতে
ছোটো-বড়ো সবাই সেথায়
উঠে যে আনন্দে মেতে।

মণ্ডা, মিঠাই, সন্দেশ খেয়ে
কাটায় সময় হই-হুল্লোড়ে
রং-বেরঙের ঘুড়ি দিয়ে
দেয় যে আকাশ ভরিয়ে।

৮ম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর এ আর উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

পহেলা বৈশাখ

আদি ও অকৃত্রিম উৎসব

বিনয় দত্ত

বাঙালির আদি, অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রধান এবং অন্যতম উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ বা বর্ষবরণ। বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখের ১ তারিখ হলো পহেলা বৈশাখ। বর্ষবরণের ইতিহাস অনেক প্রাচীন হলেও তা বর্তমানে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের আনন্দের দিন এটি।

বাঙালির পহেলা বৈশাখ উদযাপনের ইতিহাস বেশ পুরনো। হিন্দু সৌর পঞ্জিকা মতে বাংলায় বারোটি মাস অনেক আগে থেকেই পালন হয়ে আসছে। কিন্তু গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় দেখা যায়, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সৌর বছর গণনা শুরু হতো। সেই সময় সম্রাট আকবরের নির্দেশে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য শুরুর পর থেকে আরবি বছর হিজরি পঞ্জিকা অনুযায়ী ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। এই গণনাকে বলার সুবিধার্থে ফসলি সন বলা হলেও পরবর্তীতে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে তা পরিচিতি পেতে শুরু করে। মূলত এই অঞ্চলের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। বেশিরভাগ মানুষই তখন কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। অল্প কিছু লোকের ভিন্ন পেশা থাকলেও তারাও স্বল্প পরিসরে কৃষিজমিতে চাষাবাদ করতো। যেহেতু কৃষকের হাতে ফসল কাটার পরে নগদ অর্থ আসতো তাই তারা সারাবছর বাধ্য হয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাকিতে কিনতো। ফসল তোলার পর সকল বাকি যেমন মেটাতো তেমনি খাজনা দিয়ে নিজেদের দায় মুক্ত করতো।

বছরের শেষদিকে কৃষকরা দোকানিদের কাছে বকেয়া পরিশোধ করতো দেখে দোকানিরা তা একটা নির্দিষ্ট খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতো যা হালখাতা নামে প্রচলিত ছিল। কৃষকরা নিজেদের সমস্ত বা আংশিক বকেয়া পরিশোধ করে নতুন খাতায় নিজেদের নাম উঠিয়ে নিতো। এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো বাংলা বছরের শেষে এবং নতুন বছরের শুরুতে। খাজনা মেটানো এবং বকেয়া টাকা পরিশোধের এই প্রক্রিয়ায় কৃষককদের খুশি করতে মিষ্টিমুখের আয়োজন করা হতো। ধীরে ধীরে এই গোটা প্রক্রিয়া সর্বজনীনতায় রূপ নেয়। বাংলাদেশ-অঞ্চলে নববর্ষ বা বর্ষবরণ জনপ্রিয় উৎসবে রূপ নেয় মূলত ছায়ানটের উদ্যোগে।

রমনার বটমূলে প্রথম বর্ষবরণ, ১৯৬৭

পাকিস্তান সরকার বাঙালির সংস্কৃতির উপর আঘাত করেছিল দেখে তখন আমাদের উৎসাহ আরো বেড়ে গিয়েছিল।

এখন বর্ষবরণ বা নববর্ষ উদযাপন বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। সারা বিশ্বের বাঙালিরা এ দিনে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। সবার প্রত্যাশা থাকে যেন নতুন বছরটি সমৃদ্ধ ও সুখের হয়। ব্যবসায়ীরা এইদিনে নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করার উপলক্ষ্য হিসেবেও বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নেয়।

[দুই]

পহেলা বৈশাখের দিন উৎসব উদযাপনেও থাকে ব্যতিক্রমতা। সকালের সূর্যোদয়ে বৈশাখের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ভোরে রমনার বটমূলে ছায়ানটের আবাহনী সুরের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই আবাহনী সুরের রেশ মুগ্ধ করে রাখে পুরো দেশবাসীকে। বাংলা নববর্ষের সাথে ছায়ানটের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ঢাকার রমনা উদ্যানের অশ্বত্থ গাছের নিচে ১৯৬৭ সালের মধ্য এপ্রিলে তথা ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের প্রথম প্রভাতে বর্ষবরণের প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছিল বলে অনুষ্ঠানস্থলের নামকরণ করা হয় বটমূল। ১৯৭১ সালে বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের বছর ছাড়া প্রতিটি পহেলা বৈশাখেই নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে ছায়ানট। অবশ্য করোনা মহামারির সময় ছায়ানট বর্ষবরণ উদযাপন করতে পারেনি।

বাংলা নববর্ষের সাথে ছায়ানটের ইতিহাস যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজনও পহেলা বৈশাখ উদযাপনের অংশ হয়ে আছে। ১৯৮৯ সাল থেকে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। সেই সময় স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্থিতিশীল দেশের শুভকামনার প্রত্যাশায় এবং অপশক্তির বিনাশের লক্ষ্যে শুরু হয়েছিল এই মঙ্গল শোভাযাত্রা।

১৯৮৬ সালে চারুপীঠ নামের একটি প্রতিষ্ঠান যশোরে প্রথমবারের মতো নববর্ষ উপলক্ষ্যে আনন্দ শোভযাত্রা বের করে। যশোরের সেই শোভাযাত্রার উদ্যোক্তাদের একজন মাহবুব জামাল শামীম, তিনি ঢাকাতে মাস্টার্স ডিগ্রি নিতে এসে যশোরের আদলে ঢাকার চারুকলা থেকে বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু করেন। এই শোভাযাত্রায় পাপেট, ঘোড়া, হাতি ছাড়া বেশ কয়েকটি অনুষঙ্গ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে চারুকলার এই শোভাযাত্রা বিশালকায় হাতি, বাঘের প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন কারুকর্মের মধ্যদিয়ে নতুন মাত্রা পায়। শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মোটিভগুলো সবসময় লোকজ ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করে। বাঘ, হাতি, ঘোড়া, পাখি, পেঁচা, কুমির, টেপা পুতুল, গরুর

গাড়ি, পালকি, নৌকা, পাখা, লক্ষ্মীর সরা, ঝালর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রাটি আরো বর্ণিল হয়ে উঠে। অনন্য এই শোভাযাত্রাটি ২০১৬ সালে জাতিসংঘের সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো 'রিপ্রেজেনটেটিভ লিস্ট অব ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি'র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

[তিন]

রমনার বটমূলে ছায়ানটের প্রভাতী সঙ্গীতায়োজন, চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা ছাড়াও পুরো ঢাকা জুড়ে থাকে বিভিন্ন আয়োজন। পুরান ঢাকায় বসে বৈচিত্র্যময় নানা খাবারের আয়োজন। দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক এলাকায় চলে হালখাতার বাড়তি খাতির-যত্ন। এছাড়া ধূপখোলা মাঠে আয়োজিত বৈশাখি মেলায় সবার অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দেয় বাঙালি কতটা উৎসবপ্রিয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে আয়োজিত কনসার্ট, ধানমণ্ডির আনন্দর‍্যালি, গুলশানের পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি ছাড়াও ধানমণ্ডির রবীন্দ্র সরোবরে বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে সরব থাকে পুরো নগরবাসী। এছাড়া জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণে মানিকমিয়া এভিনিউয়ের রাজপথে আলপনা এঁকে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর এই কর্মসূচিতে রাজধানীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজন মিলিত হয় উৎসবের আমেজে।

শুধু ঢাকাই নয়। দেশের বিভিন্ন জেলা শহরের নববর্ষ উদযাপনের আয়োজন থাকে চোখে পড়ার মতো। বিভাগীয় শহরের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলগুলোও নববর্ষ উদযাপনে পিছিয়ে থাকে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রধান তিনটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার রয়েছে আলাদা আলাদা উৎসব। ত্রিপুরাদের বৈসু বা বৈসুব, মারমাদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। বর্তমানে তিনটি জাতিসত্তা একত্রে এই উৎসবটি পালন করে। যৌথভাবে তিনটি উৎসবের প্রথম অক্ষর নিয়ে এই উৎসবের নাম বৈসাবি করা হয়েছে। উৎসবের নানা দিকের মধ্যে অন্যতম হলো মারমাদের পানি উৎসব। বাঙালিরাও এই উৎসবে সামিল হন নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে।

[চার]

পহেলা বৈশাখ উদযাপন বা বর্ষবরণ কখনোই এত বড়ো আয়োজনে পৌঁছাতো না, যদি পাকিস্তানিরা আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত না হানতো। পাকিস্তানিরা চেয়েছিল আমাদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক অধিকার কেড়ে নিতে, তারা চেয়েছিল ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারায় উদ্বুদ্ধ করতে, কিন্তু বাঙালি জাতি যে নিজের অধিকার আদায়ে শতভাগ সচেষ্ট এই ধারণা তাদের ছিল না। বাধা পেয়ে বাঙালি জাতি এমনভাবে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হলো যে, সেই অধিকার আদায়ের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধে গড়াল।

শাদামাটা আয়োজন ছিল পহেলা বৈশাখ উদযাপনের। আজ তার বিস্তৃতি বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে এসেছে যে, বাংলা বছরের প্রথম দিন উদযাপন উপলক্ষে ঘর থেকে শুরু করে বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সবার আয়োজন থাকে চোখে পড়ার মতো। বাংলা বছরের প্রথম দিন বাড়িঘর নতুন করে সাজানো আর সবাই নিজেদের আলাদা আলাদা সাজে সাজাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভিন্ন রঙের বাহার আর রকমারি আহারে মেতে উঠে পুরো জাতি।■

কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

ক বি তা গু চ্ছ

স্বপ্নরঙিন বোশেখ এসো

হাসান হাফিজ

চৈত্র গিয়ে বছর শেষে এল রে বৈশাখ
ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার, দাও নতুনের ডাক।
শহর গ্রামে উঠবে জমে মেলা ও পার্বণ
মুড়কি মোয়া নাগরদোলায় উথালপাথাল মন।
বোশেখ এসো বোশেখ আনো আনন্দময় দিন
উজ্জ্বল খুশির প্রাণ জুড়ানোর উৎসবে রঙিন।
বোশেখ তুমি পরমপ্রিয় সবার আপনজন
সম্প্রীতি ও শান্তিধারার ভালোবাসার ধন।

খাও দু'টি ভাত মা রেঁধেছেন, আনাজ ও সালুন
মরিচপোড়া, চচ্চড়ি শাক, অল্পখানিক নুন,
দাওয়ায় মাদুর দিচ্ছি পেতে জিরিয়ে নেওয়ার পর
যায় না কওয়া উঠতে পারে কালবোশেখির ঝড়।
আম কুড়াবো, কাঁচা আমের ভর্তা ভারি স্বাদ
কী জোশ মজা বুঝবে খেলে, থাকবে না কেউ বাদ।

চৈত্র গেল বোশেখ এল নববর্ষের সে কী গো উচ্ছ্বাস
নতুন কাজে স্বপ্নে আশায়
দেশ মানুষের ভালোবাসায়
যেন বহাল বিস্তৃত হয় সেটাই মনের আশ।
সুখে-দুখে সবাই যেন মিলে থাকতে পাই
নববর্ষের প্রত্যাশা এই অন্য কিছু নাই॥

বৈশাখ

বিপুল বড়ুয়া

বৈশাখে মেলা খেলা চারদিকে ধুম
হৈ চৈ হুল্লোড়ে পালায় তো ঘুম
চারপাশ ধোয়া মোছা চারদিকে ঝাট
ঝকঝকে তকতকে ঘর উঠান বাট।

দরজায় নিমডাল ঘরে বিহু মালা
গাজনের উচ্ছ্বাসে কান ঝালাপালা
পাচনের মৌ মৌ কী দারুণ ঘ্রাণ
বাড়ি বাড়ি উৎসব উচাটন প্রাণ।

লাবন আর মিষ্টির স্বাদ কত চাখা
কে রাঙায় বাড়ি বাড়ি মিহি হাত পাখা
জমকালো মেলা বসে খুশি থৈ থৈ
বিকিকিনি খাজা গজা জিলিপি ও খৈ।

নাগরদোলা ঘোরে লোক গমাগম
কার ডাক কে শোনে আসে যায় দম
বৈশাখে সব্বার মুখে হাসি গান
আনন্দ উল্লাসে প্রাণ অফুরান।

এই বৈশাখে

পরিতোষ বাবলু

হাওলাজমি উঠছে মেতে
কোন্ সে ধানের গন্ধে?
বলেন বাবা, লক্ষ্মী সোনা
একটু পাঠে মন দে।

মেঘের পাশে রোদও হাসে
আলোর পাশে আঁধার
কালবোশেখির জন্য দেখি
চিন্তা 'ঠাকু-দাদার'!

পান্তাভাত আর ইলিশ বলে
হাত পেতে নাও আমায়
রামধনু রং আলপনা যে
মিষ্টি দিদির জামায়।

বলেন বাবা, ভাবনা কি রে
করব দেনা শোধ
মায়ের মুখে হাসি দেখে
হাসলো সোনা রোদ!

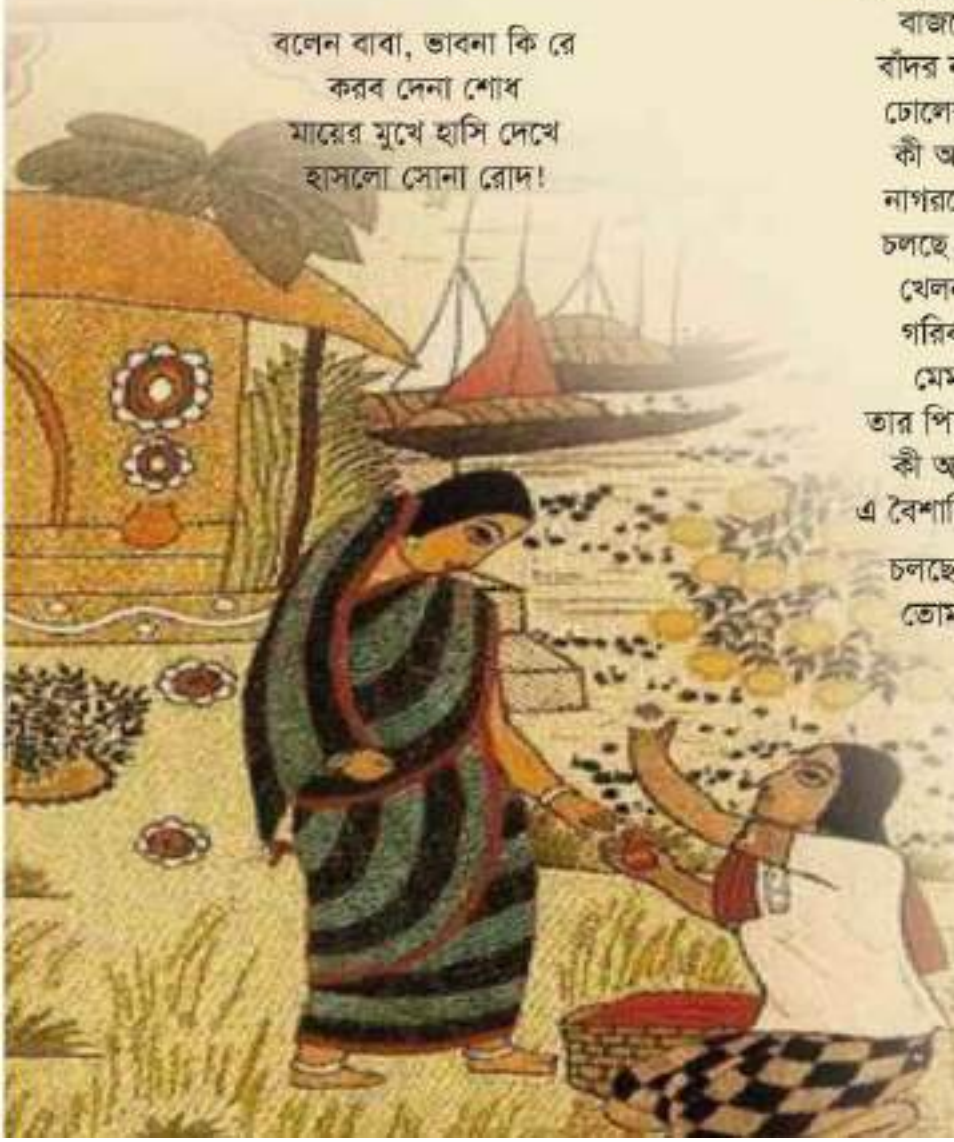

চলছে বৈশাখি মেলা

চন্দনকৃষ্ণ পাল

বটের তলে নদীর পাড়ে বসেছে আজ মেলা
সকাল থেকে সন্ধে-বিকেল কেমনে গেল বেলা।
কাচের চুড়ি নানান বাঁশি গুড় জিলিপি মোয়া
কিছুটা তাপ, সবুজ পাতা আকাশ নীলে ধোয়া।
বুকের মাঝে বাজলো বাঁশি সারাটা দিন ধরে
চললো মেলা দিনের বেলা মনটা থাকে ঘরে।
সবাই মিলে আকাশ নীলে উড়ছি যেন ঠিক
উড়ে বেড়াই ঘুরে বেড়াই ঠিক থাকে না দিক।
মেলার মাঠে নদীর ঘাটে বটের তলে যাই
বন্ধুরা সব হাঁটতে থাকি দারুণ মজা পাই।
কেউ কিনছে চিড়ার মোয়া জিলিপি নিই কেউ
আনন্দে আজ উড়ছে ঘুড়ি বুকে নদীর ঢেউ।
বছর জুড়ে আশায় থাকি আসছে মেলা এই
দৌড়ে বেড়াই আনন্দ পাই নাচি তা ধেই ধেই।
বাজছে বাঁশি চলছে হাসি চলছে হট্টগোল
বাঁদর নাচে মজাই আছে বাজছে দেখি ঢোল।
ঢোলের বোলে প্রাণটা খুলে নাচছে শিশু এক
কী আনন্দ সবার মনে দেখ তাকিয়ে দেখ।
নাগরদোলা চলছে মাঠে চলছে তো সারকাস
চলছে বেচা নিত্যদিনের দরকারি বেত-বাঁশ।
খেলনাপাতি রঙিনবাতি কাঠেরও আসবাব
গরিব-দুখি সবাই সুখি এসেছে মেমসাব।
মেমসাবের ক্যামেরাটায় শব্দ ওঠে ক্লিক
তার পিছনে শিশুর দলে হাসছে তো ফিকফিক।
কী আনন্দ কী আনন্দ আকাশ বাতাস জুড়ে
এ বৈশাখির মেলার মাঠ আজ ভাসছে কত সুরে।

চলছে মেলা চলছে খেলা তুমিও এসো প্রিয়
তোমার যত বন্ধু শত তাদের বার্তা দিও।

নববর্ষ

মুহা. রাকিবুল ইসলাম

চতুর্দিকে খুশির বন্যা
এল নতুন বর্ষ
রূপে ঘেরা বাংলা মায়ের
লাগলো মনে হর্ষ।
বিদায় নিয়ে অশুভ ক্ষণ
আসুক ফিরে শান্তি
দূর হয়ে যাক দুঃখ- কষ্ট
আছে যত ক্লান্তি।
নতুন প্রভাত নিয়ে আসুক
সবার মুখে হাসি
বুক ভরা সেই আশা নিয়ে
আনন্দতে ভাসি।
বর্বরতার হোক অবসান
হিংস্রতাকে বলি
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই
একই সাথে চলি।
একতারাতে সুর মিলিয়ে
গেয়ে যাব ছন্দ
নতুন দিনের এটাই চাওয়া
রাখব নাকো দ্বন্দ্ব।

বৈশাখ মাসে

আবদুল লতিফ

রস ভরা আম জাম
কাঁঠালের মাসে
গাছে গাছে জামরুল
টসটস রসে।

জারুল সোনালু ফুলে
গাছ যায় ভরে
বাড়ি ঘর থরথর
বৈশাখি ঝড়ে।

তরমুজ লিচু ফলা
বৈশাখ মাসে
গাছে গাছে জবা বেলি
মিটমিট হাসে।

আকাশে ঈশান কোণে
কালো মেঘ দেখে
কৃষক বাড়িতে ফিরে
মাঠে কাজ রেখে।

তপ্ত মাঠের পরে
কৃষকের হাসি
দূর থেকে ভেসে আসে
রাখালের বাঁশি।

চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব

বাংলা বছরের শেষ মাস চৈত্র মাস। এই চৈত্র মাসের শেষ দিনটিকেই চৈত্র সংক্রান্তি হিসেবে পালন করা হয়। বাংলা সব মাসের শেষ দিনকেই সংক্রান্তির দিন বলা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির নামকরণ নিয়ে ইতিহাস থেকে জানা যায়, 'চিত্রা' নক্ষত্রের নামানুসারে এ দিনের নামকরণ করা হয়। আদিগ্রন্থ পুরাণে আছে, সাতাশটি নক্ষত্র যা রাজা প্রজাপতি দক্ষের কন্যাদের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। রাজা দক্ষের দুই কন্যার নাম ছিল যথাক্রমে চিত্রা ও বিশাখা। এক মাসের ব্যবধানে জন্ম বলে এই দুই কন্যার নাম থেকেই জন্ম নিল বাংলা দুই মাস। চৈত্র ও বৈশাখ। চিত্রা নক্ষত্র থেকে চৈত্র ও বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ মাসের নামকরণ করা হয়। যেহেতু বাংলা মাসের শেষ দিনটিকে সংক্রান্তি বলা হয় তাই চৈত্র মাসের শেষ দিনটি হয়ে গেল চৈত্র সংক্রান্তি।

চৈত্র সংক্রান্তি মূলত সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে যাওয়ার একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ এক বছর থেকে অন্য বছরে পদার্পণ। চৈত্রের শেষ আর বৈশাখের শুরু এ দিনগুলোকে ঘিরে বাংলা ও বাঙালির মধ্যে বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব পালিত হয়। বাংলা বর্ষে বৈশাখের মতো চৈত্র সংক্রান্তিতেও ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি ও বাংলার মানুষ নানা উৎসব পালন করে। চৈত্র সংক্রান্তির তেমনই কিছু উৎসব তোমাদের জন্য–

শাকান্ন : চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে এককালে শাকান্ন পালিত হতো। এদিন সকাল বেলাতে বাড়ির চারপাশের ঝোপঝাড় থেকে শাক তুলে আনতো বাড়ির মেয়েরা। তবে এই শাক কিন্তু আবাদি বা চাষ করা নয়। হতে হবে অনাবাদী জায়গার। এমন চৌদ্দ পদের শাক দিয়েই সেদিন দুপুরের আহার হতো। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বাড়িতে কোনো মাছ মাংস রান্না হতো না। বাংলার কোনো কোনো গ্রামে এখনও শাকান্ন উৎসব পালিত হয়।

তালতলার শিরনি : চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে সেই চাঁদার টাকায় কেনা হতো চাল, গুঁড় ও দুধ। সেই দুধ, চাল, গুঁড় দিয়ে গাঁয়ের সবচেয়ে উঁচু গাছের নিচে নিয়ে রান্না করা হতো শিরনি বা পায়েশ। এই শিরনি খেতে গ্রামের মানুষ জড়ো হতো সে গাছের তলায়। বেশিরভাগ সময়ই তালগাছ উঁচু হওয়ায় তালগাছের নিচে শিরনি রান্না হতো বলে লোকমুখে সেই খাবারের নাম ছিল তালতলার শিরনি। এখন এই উৎসব তেমন চোখে পড়ে না।

চৈত্র সংক্রান্তির লোকজ চড়ক পূজা : চৈত্র সংক্রান্তির দিনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের লোকজ পূজার চল ছিল। চৈত্র সংক্রান্তি ও এর আগের কয়েকদিন মিলে পালিত হতো চড়ক পূজা। এদিন মনের বাসনা পূরণের আশায় পূজা ও নানারকম মানত করা হতো। একসময় বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলে পালিত হতো চড়ক পূজা। চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে বেশিরভাগ গ্রামে আজো বসে সপ্তাহব্যাপী মেলা। ■

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়

মো. সিরাজুল ইসলাম

মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এই সরকার কীভাবে, কোন প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছিল, কী ভূমিকা পালন করেছিল, প্রত্যেক বাঙালিরই তা জানা দরকার। নতুন প্রজন্মের জন্য তা আরো গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর সরকার শপথ নেয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারই হলো মুজিবনগর সরকার। মুজিবনগর বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাইরে থেকে পরিচালিত হয়েছিল বলে এ সরকার প্রবাসী মুজিবনগর সরকার হিসেবেও খ্যাত। আবার কেউ বা বলেন বিপ্লবী সরকার।

বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের মানুষ এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ পরাধীন ছিল। তাঁর নিজস্ব মানচিত্র ছিল না, পতাকা ছিল না, ছিল না সংবিধান। এগুলো সবই এখন বাংলাদেশের আছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বৈরাচার পাকিস্তানি সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার মুক্তিকামী জনতা যে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে সেই প্রতিরোধেই বিজয়ী হয়ে আমরা অর্জন করি বাংলাদেশ।

১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের হাতে পাকিস্তানি শাসকরা ক্ষমতা দেয়নি। ১৯৭১ সালের মার্চে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রতিদিনই ঘটতে থাকে অভাবিত ঘটনা। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের পরে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। অপ্রত্যাশিত সেই দম আটকানো পরিস্থিতিতে বাঙালি মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে। মুক্তির লক্ষ্যে তারাও সংগঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। অতঃপর তাঁকে বন্দি করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই দেশে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। দিশেহারা বাঙালির সামনে তখন আবির্ভূত হন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহচর। অত্যন্ত বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তাঁরা বাঙালি জাতিকে একসূত্রে গাথার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার গঠন করেন ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল। বাংলাদেশ সীমানার বাইরে ভারতের আগরতলায় গোপনীয় স্থানে এ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। প্রতিবেশী ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ দেশ-বিদেশের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী এসে দাঁড়িয়েছিল মুজিবনগর সরকারের পাশে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের যে পথচলা শুরু হয়, ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলে মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এরপর ১৭ই এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শপথ গ্রহণের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক বৈধতা নিশ্চিত করে মুক্তিযুদ্ধ তথা জনযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে শত্রু মুক্ত করে সুমহান বিজয় ছিনিয়ে আনা। মূলত মুজিবনগর সরকার থেকেই বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। বাস্তবে তখন এটি মুক্ত-স্বাধীন দেশ নয়, সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। বাংলাদেশের মাটি দখল করে আছে হানাদার বাহিনী; নির্বিচারে হত্যা করছে মানুষকে। তাই বাংলাদেশকে হানাদারমুক্ত করতে একটি সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেই অপরিহার্যতার বাস্তব রূপ হলো মুজিবনগর সরকার। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল শপথ নেয়ার স্থান মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলাকে তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করেন মুজিবনগর। সেখানে শপথ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রথম সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিতি লাভ করে।

এর আগে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ একাত্তরের ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায় ভারতের পশ্চিম বাংলার সীমান্তে পৌঁছেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ৩১শে মার্চ মেহেরপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পা রাখেন। মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী তাঁদের সহায়তা প্রদান করেন। ১০ই এপ্রিল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা, ত্রিপুরার আগরতলায় এক যুক্ত অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে গঠন করলেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার।

১১ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতারে দেশবাসীর উদ্দেশে বেতার ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণ আকাশবাণী ও বিবিসি থেকে প্রচারিত হয়। ভাষণে তিনি দেশব্যাপী পরিচালিত প্রতিরোধ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এছাড়াও ১৭ই এপ্রিল মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হয়। সরকার গঠনের পর শপথ নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং শপথ অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত ছিল।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এমন একটি নিরাপদ ও মুক্ত অঞ্চলের সন্ধান করা হচ্ছিল যার সঙ্গে কলকাতার সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে। এই নিরিখেই তৎকালীন বৈদ্যনাথতলার আমবাগানকে নির্বাচন করা হয়। এলাকাটির তিন দিকেই ভারত। তাই পাকিস্তানি বিমান হামলার আশঙ্কা ছিল না।

সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল পুরো অঞ্চল ঘিরে। ১৭ই এপ্রিল বেলা ১১টা ১০ মিনিটে শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এ ঘোষণাপত্রই স্বাধীনতার সনদ নামে পরিচিত। সেখানে স্বাধীন দেশের নামকরণ করা হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে আইনগত ভিত্তি দেওয়ার প্রয়োজনে স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা হয়েছিল।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি রচনা করেছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম। ১৯৭২ সালের সংবিধান রচনার আগ পর্যন্ত এই ঘোষণাপত্রটিই ছিল বাংলাদেশ সরকারের আইনি ভিত্তি। এই ঘোষণাপত্রের সূত্র ধরেই ১৯৭২ সালে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। অর্থাৎ এই ঘোষণাপত্রটিই ছিল বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান এবং বাংলাদেশের জন্মসনদ।

তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণের মধ্য দিয়েই দেশ-বিদেশের মানুষ জানতে পারেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে আইনানুগ সরকার গঠিত হয়েছে। এরই পথপরিক্রমায় ১৭ই এপ্রিল সকালে মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেওয়ার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী গ্রাম বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আবদুল মান্নান এমএনএ। নবগঠিত সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সেখানে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান। তারপর বাংলাদেশের মানচিত্রশোভিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। স্থানীয় চার তরুণ শিল্পী ও সমবেত মানুষের কণ্ঠে গাওয়া হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

কাকতালীয় ব্যাপার হলো, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির আমবাগানে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। সেই পলাশির আমবাগানের মাত্র ২৩ মাইল দূরে ২১৪ বছর পর ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার, ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আরেক আমবাগানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতার অস্তমিত সূর্য আবার উদিত হয়।

দেশি-বিদেশি শতাধিক সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত সময়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেন। মঞ্চে থাকা ৬টি চেয়ারের মধ্যে একটি খালি রাখা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য। সেখানে Declaration of Independence (স্বাধীনতার মূল ঘোষণা আদেশ) এ সরকারের অধ্যাদেশে ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হয়।

১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নিলেও ১৮ই এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদের প্রথম সভায় মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করা হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) নির্বাচিত করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম পরে তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন।

মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বন্টন ছিল এরকম:

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- রাষ্ট্রপতি

২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম- উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানে অন্তরিন থাকার কারণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

৩. তাজউদ্দীন আহমদ- প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, তথ্য, সম্প্রচার ও যোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা বিভাগ, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম, সমাজকল্যাণ, সংস্থাপন এবং অন্যান্য যেসব বিষয় কারও ওপর ন্যস্ত হয়নি।

৪. খন্দকার মোশতাক আহমদ- মন্ত্রী, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫. এম মনসুর আলী- মন্ত্রী, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৬. এ এইচ এম কামারুজ্জামান- মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী মুজিবনগর সরকারের মুক্তিবাহিনীর প্রধান কমান্ডার ও মেজর জেনারেল আবদুর রব চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যুদ্ধরত অঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে প্রতিটিতে একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেয়। তবে ১০ নং বা নৌ সেক্টরে কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না। কমান্ডাররা যখন যে এলাকায় অভিযান করতেন সে সেক্টরের কমান্ডারের অধীনে থাকতেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাবেক জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে বাঙালিদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। ১৭ই এপ্রিল শুধু একটি সরকারের শপথ অনুষ্ঠান ছিল না-এ অগ্নিশপথের মধ্যে নিহিত ছিল পরাধীন পূর্ব বাংলাকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও স্বাধীন করার প্রেরণা। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ফলে দেশ-বিদেশে বাঙালিদের পক্ষে জনমত সুদৃঢ় হয়। তখন বাংলাদেশ বিরোধী চক্র ছাড়া পৃথিবীর সব শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষই বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গঠিত হলেও এদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ভারতের মাটি থেকে। কলকাতা ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িতে এ সরকারের অফিস স্থাপন করা হয়। সেখান থেকেই পরিচালিত হয় মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করাসহ পরিস্থিতির প্রয়োজনে সব কাজ তাঁরা করেছেন।

রাশিয়া জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভেটো দেয় এবং আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের বিরুদ্ধে রাশিয়া ২০তম নৌবহর পাঠানোর ঘোষণা দিলে সপ্তম নৌবহর ফেরত যেতে বাধ্য হয়। বহির্বিশ্বে বাঙালিদের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা, চীন, মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ছিল। আজকের বাংলাদেশ মূলত ত্রিশ লাখ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত। কিন্তু এ অর্জনের পেছনে ছিল মুজিবনগর সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও জাতীয় চার নেতা-সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম. মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামানের অসামান্য আত্মত্যাগ।

মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল কেবল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে, যা প্রবাসী সরকার গঠনের ইতিহাসে বিরল। এমনকি এ সরকারের প্রধান সেনাপতিও ছিলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। মুক্তিযুদ্ধের ওপর এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

এক নজরে মুজিবনগর সরকার

- গঠিত হয় ১০ই এপ্রিল ১৯৭১
- শপথ গ্রহণ করেন ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- রাষ্ট্রপতি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দিন আহমদ
- অর্থমন্ত্রী : এম মনসুর আলী
- স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পূণর্বাসনমন্ত্রী : এএইচএম কামারুজ্জামান
- পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমদ
- প্রধান সেনাপ্রতি : কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী

মুজিবনগর সরকারকে ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া কয়েকটি বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। সরকারের কর্মকাণ্ড তিন ধরনের বিভাজন ছিল: বেসামরিক প্রশাসন, সামরিক বিষয়াবলি (প্রধান বিষয়) এবং স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক তৎপরতা। মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরও কয়েকটি সংস্থা সরাসরি মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে কাজ করত। যেমন-পরিকল্পনা কমিশন, শিল্প ও বাণিজ্য বোর্ড, নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ও অভ্যর্থনা শিবির, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি, শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড, কৃষিবিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই যশোর সেনানিবাস যৌথ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ওয়ালিউল ইসলামকে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সচিব) যশোরের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে পোস্টিং দেয়। ওয়ালিউল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ডেপুটি কমিশনার। যখনই কোনো ভূখণ্ড শত্রুমুক্ত হচ্ছিল, তখনই মুজিবনগর সরকার ডেপুটি কমিশনার পাঠাচ্ছিল। এদিকে পিছুহটা পাকিস্তানিরা নির্মমভাবে নিরীহ বুদ্ধিজীবী ও সরকারি কর্মচারীদের হত্যা করা শুরু করে।

১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত বিজয়। ২২শে ডিসেম্বর এ সরকার ঢাকায় ফিরেছিল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের এই প্রথম সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এর আগেই ভারত ও ভুটান এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর ছিল মুজিবনগর সরকার। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর

বিরুদ্ধে দেশের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী সংগঠন ও সমন্বয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় এবং এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তাকারী রাষ্ট্র ভারতের সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক রক্ষায় এই সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

মুজিবনগর সরকারের অন্যতম সফলতা হলো, বাংলার শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনতার মুক্তির বাসনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমর্থন লাভ এবং মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতা অর্জন। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে এবং বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে বিশ্বজনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিল। সামরিক বিজয়ের আগেই কূটনৈতিক সাফল্যের সূচক হিসেবে ভুটান ও ভারতের স্বীকৃতি অর্জন করা। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন, মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ জনগণের মনোবল ঠিক রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করাও এ সরকারের অন্যতম সফলতা। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার যেমন সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করেছিল, একইভাবে সরকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় ও বিভিন্ন বিভাগ গঠন করে বেসামরিক প্রশাসনকে সংগঠিত করে যুদ্ধে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, নিজস্ব আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা, প্রায় এক কোটির মতো শরণার্থীর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা

অর্জন, এসব দিক বিবেচনায় মুজিবনগর সরকার ছিল সত্যিই অতুলনীয়। পাকিস্তানের মতো একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, নয় মাসের মধ্যে বিজয় ছিনিয়ে আনাটা সত্যিই একটি কঠিন কাজ ছিল। আর এই কঠিন কাজটি সুচারুরূপে ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার।

৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত এবং ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা উপহার দেয়। তাই মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারাকে একটি সুশৃঙ্খল রূপ দিতে এবং বাঙালির বিজয় নিশ্চিত করতে মুজিবনগর সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ড. আকবর আলি খান লিখেছেন, 'সামনে তখন মুক্তিযুদ্ধের চেয়েও বড়ো চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা।'

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা বা জননেত্রী শেখ হাসিনার সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রেরণার বাতিঘর হয়ে থাকবে মুজিবনগর সরকার।

তথ্যসূত্র :

হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র, ঢাকা, ১৯৮২;

এইচ.টি ইমাম, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, ২০০৪;

নূরুল কাদের, একাত্তর আমার, ১৯৯৯

শামসুল হুদা চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর, ১৯৮৫

বিবি বিশ্বাস, একাত্তরে মুজিবনগর, ২০০০

মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, ২০০৮

আকবর আলি খান,মুজিবনগর সরকারের শেষের কয়েকটি দিন

আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার, যুগান্তর, ১৭ই এপ্রিল ২০২২

মোনায়েম সরকার : মুজিবনগর সরকার : কাছ থেকে দেখা ১০ই এপ্রিল ২০২২

মো. সিরাজুল ইসলাম, ১৭ই এপ্রিল :মুজিবনগর দিবস ও মুজিবনগর সরকার, নবারুণ, এপ্রিল ২০২১

মুহিদ রহমান, মুজিবনগর সরকার গঠন প্রক্রিয়াটি খুব সহজ ছিল না, যুগান্তর, ১৭ই এপ্রিল ২০২২

'মুজিবনগর সরকার থেকেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল' যুগান্তর প্রতিবেদন ১৮ই এপ্রিল ২০২২

এম. এ. বাসার,মুজিবনগর সরকারঃ প্রেরণার বাতিঘর, যুগান্তর ১৭ই এপ্রিল ২০২১

সুদূরপ্রসারী সাংবিধানিক পদক্ষেপ ছিল মুজিবনগর সরকার গঠন

মুজিব থেকে মুজিবনগর সরকার ইত্তেফাক অনলাইন ডেস্ক,প্রকাশ : ১৯ই জুন ২০২১

মুজিবনগর সরকার যেভাবে গঠিত হয় ফিচার ডেস্ক ১৭ই এপ্রিল ২০১৯

মুজিবনগর সরকার, প্রথম আলো ডেস্ক, প্রকাশ: ০৭ই ডিসেম্বর ২০২১,

ঐতিহাসিক মুজিনগর দিবস আজ, ডেইলি স্টার, ১৭ই এপ্রিল ২০২২ ■

সহযোগী অধ্যাপক, খুলনা বিএল কলেজ

গল্প

স্মৃতি ঘেরা শৈশব ও বৈশাখ

হাসান ইকবাল

চৈত্রসংক্রান্তির সময় এসে গেলে ব্যস্ততা বেড়ে যেত গাঁয়ে। পাটক্ষেতে তখন নিড়ানির ধূম। বাড়ির বড়োরা দলবেধে বসে পাটের চারা নিড়ানি দিত। বড়োরা বলতে আমার বাবা, চাচা ও বাড়ির বাৎসরিক কাজের লোক। সংক্রান্তির আগেই নিড়ানি শেষ করার জন্য দূর গাঁয়ের লোকেরা আসতো কাজের খোঁজে। বৃষ্টি ও ঝড় শুরু হয়ে গেলে উর্বর জমি নরম হয়ে যায়, তখন আর নিড়ানি দেওয়া যায় না। ঘন পাটের চারা তোলা যায় না, আগাছা সরানোও যায় না। জমিতে পা দেবে যায়। কদিন বাদেই বৈশাখ আর বৈশাখি ঝড়ের তাণ্ডব এবং আম কুড়ানোর ধূম।

এই সময়টাতে আমরা ছোটো ছোটো ছেলে- মেয়েরা ঘুড়ি উড়াতাম। তেলেঙ্গা ঘুড্ডি, চিল ঘুড্ডি, ঢোল ঘুড্ডিসহ নানা জাতের নানা রঙের ঘুড়ি। কোনোটা ভোঁ ভোঁ শব্দ তুলে আকাশ পাড়ি দিত। সে ঘুড়ির নাম চিল ঘুড়ি। চিলের মতো বিশাল ডানাওয়ালা ঘুড়ি। ঘুড়ির মাথায় বেঁধে দিতাম তালের পাতা দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি ধনুক। তালের পাতলা পাতায় বাতাসে ধাক্কা লেগে দারুণ এক শব্দ হতো । কেউ কেউ বলত-'এইড্যা হেলিকপটার ঘুড্ডি।' ঘুড়ি উড়াতে হলে নাটাইয়ের সুতো ধরে দৌড়াতে হয়। আর সুতোর টান লেগে ঘুড়ি উপরে উঠতে থাকে। আর ছেলেরা চিৎকার করে বলত-'ঘুড্ডি উড়ে ফন্‌ফন্‌।' সুতোর নাটাই ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে কখন যে আমরা সেই নিড়ানি দেওয়া বৃষ্টি ভেজা নরম পাটক্ষেতের উপর দিয়ে দৌড়িয়েছি তার হুঁশ জ্ঞান আমাদের থাকত না। কাদামাটিতে পা যখন উঠাতে পারতাম না, তখন টের পেতাম। কতজনের পাটক্ষেত আমরা মাড়িয়েছি তা টের পেতাম পরদিন সকালে, যখন ডজন ডজন নালিশ আসতো আমার দাদার কাছে-'তোমার বান্দর নাতি পাটক্ষেতের সর্বনাশ কইর‍্যালছে।' আর তখন দাদার কাছাকাছি থাকাটা যে নিরাপদ নয়, সেটা ঠিকই বুঝতে পারতাম।

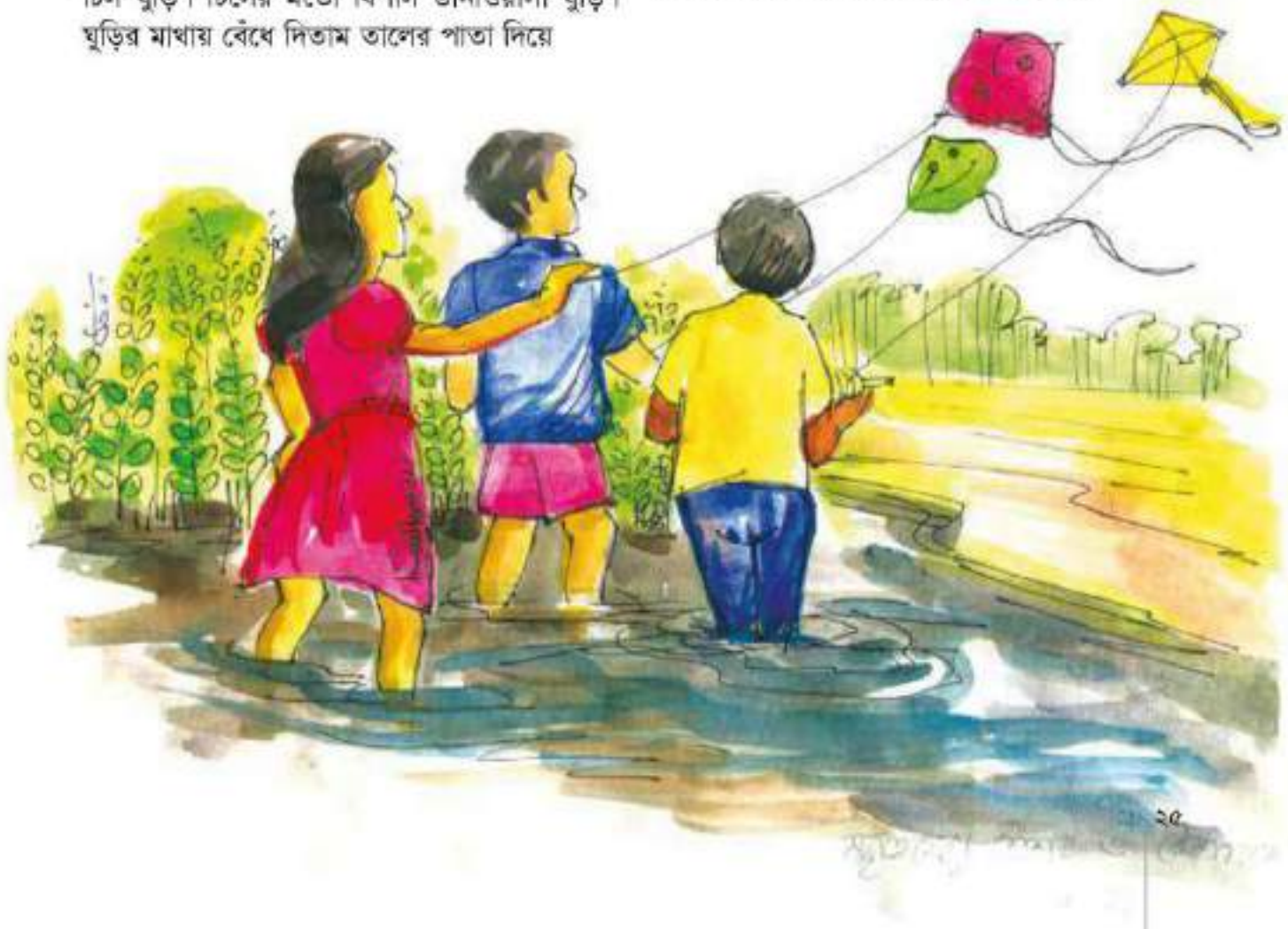

চৈত্রসংক্রান্তিতে লোকধাঁধা ও শিলুক, মেয়েলি গীত, বৃষ্টির গান, বারোমাসি গান, ঘাটু গান, আমতলার সংযাত্রা, লোকমেলা, ঘুড়ি উৎসব, কীর্তন, ফসল কাটা-ফসল তোলা, ধানভানার গান, বাউল-মুর্শিদী, দেহতত্ত্ব, মারফতি, ভাটিয়ালি, পক্ষী শিকারের গান (কোড়া শিকার), পুথি পাঠ, হালকার গান, আঞ্চলিক গান, কবিগান, পল্লি গান, ফকিরালি জিকির গান, খেয়ালি ও রাখালি গান, পালা-গীতি, পাড়া-গাঁয়ের ছড়া, দরবারি শিলুক, পল্লিগীতি অভিনয়, সাপের মন্ত্র, বারনী-আড়ং, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, চৈত্রসংক্রান্তিতে মশা-মাছি তাড়াবার আনুষ্ঠানিকতা, গিমাই শাক রান্না, মন্ত্রের বুলি আউড়িয়ে শোলা দিয়ে দাদা-দাদি সম্পর্কীয়দের পেটানো, লোককাহিনি নির্ভর কিচ্ছা, পালাগান, জাদু টোনা মন্ত্র, গাইনের গীত, হিরালি, পালকির গান এসব অধিকাংশই আমাদের দেখার ও শোনার সৌভাগ্য হয়েছে।

সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যে থেকে আমরা পাটশোলার লুক্কা (আঁটি) বেঁধে প্রস্তুত থাকতাম পাড়ায় পাড়ায় লুক্কা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য। আর ক্ষেতের আইল ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে লোকছড়া বলতাম সবাই।

বাঁশ কাটি কাটুর-কুটুর
ঝিংগা কাটে মদিনা,
আমার বইন ছকিনা
তিনদিন ধইর‍্যা দেখি না।
তিনদিনের জ্বরে,
মাথা বেদনা করে।
বকুল ভাইগো ভাই, কবে বিয়া করবাইন,
সামনের শুক্কুরবারে।
লাল একটা শাড়ি দিয়াম ঝিলমিল করে।
তেলের একটা পট দিয়াম সিঁথি বাইয়া পড়ে
হাত ভরা চুড়ি দিয়াম ঝুমুর ঝুমুর করে।
ছিম গাছের তলে বুজি গোসল করে
কালা জামাই দেইখ্যা বুজি টানামানা করে।
রাঙা জামাই দেইখ্যা বুজি ফুলের বিছনা করে।

(আঞ্চলিক শব্দার্থ: বইন-বোন, বেদনা-ব্যথা, শুক্কুরবার-শুক্রবার, বুজি-বড়ো বোন ।)

চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন আমতলা বাজারে বারনী মেলা বসতো। গ্রামের মানুষের সমাজ জীবনের নানান নিরূপম অনুষঙ্গ দেখা যেত এই মেলায়। কৃষি যন্ত্রপাতি, লাঙল, জোয়াল, মই, বিন্দা (আঁচড়া) প্রচুর আসতো। ছেলে-মেয়েদের খেলার জিনিস পুতুল, বাঁশি, খাওয়ার জন্য লাড়ু- মুড়ি খৈয়ের মোয়া, শিরার গুড়, বাতাসা ও খেলনা। ডাব, তরমুজ, খিরা বিভিন্ন ফলের সমাহার। বাবা অনেক সময় নেত্রকোণা যেতেন, ফেরার পথে আমাদের জন্য তরমুজ, খেলার বাঁশি, ঘুড়ি নিয়ে আসতেন। আজ বৈশাখ এলেই দাদার কথা মনে পড়ে।

দুঃখু কইও
বন্দের লাগ পাইলে গো নিরলে,
আমার বন্দু রঙিচঙি
জলের উপর বানচে টঙ্গি গো
দুই হাত উড়ায়া বন্ধে
ডাকে গো নিরলে
দুঃখু কইও বন্ধের লাগ পাইলে।।

(রাখালি গান, রওশন ইজদানী)

আমাদের বাড়ির ডানপাশেই বড়ো পুকুর। পুকুরের চারধারে আমগাছ। যেদিন বিকেল থেকে আকাশে গুড়ুম গুড়ুম শুরু হতো, আমাদের মনের ভেতরও ঠিক তেমনি গুড়ুম গুড়ুম শুরু হতো। দিগন্ত ছুঁয়ে আকাশ জুড়ে মেঘের দাপাদাপি। কালো দৈত্যের মতো বিশাল বিশাল মেঘ, সন্ধ্যে হলেই শুরু হতো কালবোশেখি ঝড়। মা ভয়ে অস্থির থাকতেন। অনবরত পড়ে যেতেন-

'লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জুয়ালেমিন।' আমরাও বিড়বিড় করে বলতাম। আর প্রতীক্ষার প্রহর গুণতাম, কখন থামবে এই ঝড়। কোনোদিন রাত দশটা নাগাদ ঝড় থেমে গেলে ভাইবোনেরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়তাম আম কুড়াতে। দেরি হলে পাড়ার অন্য ছেলেরা আম কুড়িয়ে নিয়ে যাবে পিছনে সে ভয়। তাই বৈশাখ আসলে আমাদের রুটিন ওয়ার্ক বেড়ে যেত। বৃষ্টি থামলেই ঝড়ো হাওয়া পুরোপুরি থামত না।

আমরা বেরিয়ে পড়তাম ঘর থেকে মায়ের শত মানা সত্ত্বেও। এক হাতে হারিকেন, কেরোসিনের কুপি বাতি নিয়ে আম কুড়ানোর নেশায়। কখনো গাছের ফাঁকে আলো আধারির অদ্ভুত কিছু দেখে চিৎকার করে এক দৌড়ে চলে আসতাম ঘরে। মনটা পড়ে রইতো আমগাছতলায়। ঝড়ো হাওয়ায় কুপি বাতি যাতে নিভে না যায় তাই বাঁশ-বেতের তৈরি মাছ ধরার ঝাঁকায় কুপি রাখা হতো। আম কুড়াতে কুড়াতে খাঁচা ভারী হয়ে উঠলে বড়োদের সাহায্যের জন্য চিৎকার করতাম।

বৈশাখের কোনো রোদহীন বিকেলে আমাদের সাহায্যকারী ইসলামুদ্দী চাচার সাথে যেতাম পোনা মাছ ধরার জন্য। বিলের ধারে ধানক্ষেতের ভেতর খুঁজতে হয় পোনা মাছ। পোনা মাছ হলো টাকি মাছের ছানা। একটা বড়ো মা টাকি মাছের সাথে ঘুরে বেরায় কয়েক লক্ষ টাকির পোনা। আমার মা কাঁঠালের বিচি কুচিকুচি করে কাঁচা মরিচ দিয়ে এক বিশেষ ধরনের সুস্বাদু ভাজি তৈরি করতেন। পোনা ভাজি। গরম গরম ভাত দিয়ে খেতে এক কথায় অমৃত।

বৈশাখের মাঝামাঝি সময়ে নদীতে ও বিলে পানি বেড়ে যেত। আমাদের পুকুরে ডুবিয়ে রাখা বড়ো বড়ো দুটো বিশাল নৌকা উঠানো হতো বাইরে চলাচলের জন্য। আমাদের হালচাষের কয়েক ডজন গরু-বলদের ঘাস কাটতে হতো বিল থেকে। ইসলামুদ্দী চাচা খুব সকালে ডিঙ্গা কলা কিংবা কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে এক বোল পান্তা ভাত খেয়ে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন গরুর ঘাস সংগ্রহের জন্য।

আমাদের বাড়ির অদূরেই ছিল একটি গ্রাম্য বাজার। লালছান্দের বাজার। বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনে এখানে বারনী বসতো। সে বারনী মেলায় আমরা সবাই যেতাম। নানান রঙের বানর, খেলনা, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা, টমটম গাড়ি, ফটাস আর নারকেলি আর বোনদের জন্য পুতুল কিনে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরতাম। বছরের শুরুতে এই দিনগুলোর জন্য আমরা দিনের পর দিন অপেক্ষা করতাম। সে দিনগুলো ছিল সত্যিই মধুর। ■

কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

গল্প

বৈশাখি মেলায়

রশীদ এনাম

ঘট ঘট করে পানি পান করার শব্দ। বৈশাখের উত্তপ্ত রোদে হাঁপিয়ে উঠেছে ইসাম ও ওয়াসিফ। দুজনে বাহির থেকে এসে পানি পান করছে। পানি পান করে দিল দৌড়। পুকুর পাড়ের গাছে উঠেছে রায়িদ, তাকে এক ঝাঁক কাক ঘিরে ধরেছে। বেচারা কাঁচা আম পাড়তে উঠেছিল, নিচে আম কুড়াতে ব্যস্ত ইনকিয়াত। ওদের সাথে দিহাম, জোহানও যোগ দিয়েছে। ওরা সবাই দুরন্ত কৈশোরে পা রেখেছে। মোহছেনাও পশ্চিম পটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে সবাই। ইসামের বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছিল, ইসাম খুব মেধাবী ছাত্র, সে ঘুমের ভান করে চোখ বুজেছিল। বাবা-মায়ের চোখে ঘুম নেমে আসতেই ওরা উঠে গুটিগুটি পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। ইশকুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বর্ণদের আমগাছটা ওদের চোখে পড়েছিল। গাছে বড়ো বড়ো থোকায় থোকায় আম ঝুলছে। ইশকুলের বন্ধুরা মিলে ঠিক করল যে করেই হোক আমগুলো পেড়ে খেতে হবে।

একদিন পড়ন্ত বিকালে আম পাড়তে গিয়ে বেচারারা বিপদে পড়ল। ওদেরকে বাড়ির পালা কুকুর টমি তাড়া করেছিল। ভাগ্যিস ধরতে পারেনি, আরেকটু হলে কামড় বসিয়ে দিত। পরদিন ইশকুলে যাওয়ার পথে আবারও পরিকল্পনা– বর্ণদের টমি কুকুরের জন্য বাজার থেকে গরুর মাংসের উচ্ছিষ্ট অংশ কিনে আনবে। কুকুরকে আম পাড়ার আগে খেতে দিলে সে আর ঘেউ ঘেউ করবে না। পরদিন দুপুরবেলা আম পাড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হলো। কুকুরকে মাংস খেতে দিয়ে ওয়াসিফ টপটাপ করে গাছে উঠে গেল। গাছে উঠে বেশ কিছু আম পেড়ে নিয়ে আসল। কাঁচা আমের ভর্তা করার জন্য ওরা চান্দখালি নদীর পাড়ে চলে গেল। চান্দখালি নদীতে বাঁশের ভেলা ছিল । বাঁশের ভেলায় উঠে, শামুকের খোল দিয়ে আম ছিলে ভর্তা করে, মজা করে সবাই আমভর্তা খেল।

ভর দুপুরের গরম সহ্য করতে না পেরে, গাছে উঠে পুকুরে লাফ ঝাপ দিয়ে ডুব সাঁতার কাটা। সে সময় পুকুরের পানিতে এক প্রকারের মরিচ খেলা খেলত সবাই। আজকাল দেখা যায় না সেই মরিচ খেলা। খেলার ধরনটাও বেশ মজার,একজনে পুকুরের পানিতে আঙুল উঁচু করে বলবে এটা কি ? অন্যজন বলবে মরিচ, তখন প্রত্যুত্তরে সে বলবে এক ডুব দিয়ে ধরিছ। তখন ডুব দিয়ে ধরতে পারলে গেম হয়।

পরদিন সবাই আবার পরিকল্পনা করল, তালগাছে উঠে বাবুই পাখি ধরবে। টিয়া পাখির ছানা চুরি করবে । ইসকুলের টিচার বলেছিল তালগাছে সাপ থাকে সেই ভয়ে আর বাবুই পাখির বাসা চুরি করার সাহস পায়নি।

ইসামের বন্ধু ফারাজ আর মাহাদি মিলে একদিন ঠিক করল, নেজাম মহলের নারিকেল বাগান থেকে ডাব পেড়ে খাবে। দুপুরবেলা ধরা পড়বে সেই ভয়ে ঠিক করল জোছনা রাতে ডাব পাড়বে। পরদিন সন্ধ্যায় লোডশেডিং শুরু হয়। ওরা সবাই মহা খুশি। ডাব পাড়তে সহজ হবে, একে একে প্রবেশ করল নারিকেল বাগানে, হঠাৎ তক্ষক ডেকে উঠল, টোট ট্যাং ! টোট ট্যাং করে। ইসাম ভয় পেয়ে গেল। ইসাম গাছে উঠল ডাব পাড়ার জন্য । ডাব পেড়ে সে গাছেই উঠে খাওয়া আরম্ভ করল। ওদের বন্ধু জারিফকে গাছের নিচে পাহারা দিতে বলল, যদি কেউ আসে তাহলে সে কু করে ডাক দিয়ে সতর্ক করবে। হঠাৎ গাছ থেকে একটা ডাব নিচে পড়ে গেল। নেজাম মহলের দারোয়ান জাহাঙ্গীর চাচা চোখে আবার কম দেখে। সে কে কে বলে গাছের নিচে এসে পাইচারী করতে লাগল। ওদিকে জারিফ কু কু করে ইসামকে সতর্ক করল। জাহাঙ্গীর চাচা গাছের নিচ থেকে কিছুতে সরে না। ঠিক সে সময় ইসাম গাছ থেকে ডাবের পানি ফেলে দিল দাড়োয়ান জাহাঙ্গীরের শরীরে। জাহাঙ্গীর চাচা মনে করেছে, কলা বাদুর হয়ত হিসু দিয়েছে। মনে মনে কলা বাদুড়কে গালি দিয়ে বলে উঠল– মরার বাদুড় আর জায়গা পাইলি না। জাহাঙ্গীর চাচা এবার দৌড়ে ঘরে ফিরে যাবে ঠিক তখনই জারিফ খিল খিল করে হেসে উঠল। জাহাঙ্গীর চাচা এবার লাঠি নিয়ে আসল। সে বুঝতে পারল যে, গাছে কেউ একজন ডাব পাড়তে উঠেছে। জাহাঙ্গীর চাচার হাতে ধরা পড়বে ইসাম। সে আরেকটা বুদ্ধি বের করল, জাহাঙ্গীর চাচা চোখে দেখে না। ইসাম করল কি একটি ডাব পুকুরের মধ্যে ছুঁড়ে মারল। সাথে সাথে ইসাম চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, চাচা চাচা ডাব চোর পুকুরে লাফ দিয়েছে। বোকা দারোয়ান জাহাঙ্গীর ডাব চোর ধরার জন্য সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে লাফ দিল। ওদিকে ইসাম জারিফ হাসতে হাসতে ডাব নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।■

গল্পকার

গল্প

শুভবোধ

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

সাত বছরের ছোট্ট ছেলে শুভ্র। খুব চঞ্চল। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান বলে সবার আদরটা সে একাই পায়। তাই যখন তার এক একটা আবদার মাথায় চলে আসে তখন সেটাই তার চাই। তাকে নিয়ে মার্কেটে এলে বিপাকে পড়তে হয় বাবা-মাকে। এদিক সেদিক ছুটাছুটি করবে। আর সামনে যা পায় তা দেখেই কিনতে চাবে। হোক সেটা জামা কাপড় বা খেলনা সামগ্রী। ওকে সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় মাঝে মাঝে। বাবা মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে রাখে। পরক্ষণেই আবার মা এসে আদর করে রাগ ভাঙিয়ে দেয়। এভাবেই চলতে থাকে শুভ্রের দিনগুলো।

কিছুদিন পর শুভ্রের জন্মদিন। তাই বাবা-মা তাকে নিয়ে একটি মর্কেটে গেছে কিছু কেনাকাটা করার জন্য। শুভ্রকে দেখিয়ে মা বলে, তোমার যে জামাটা পছন্দ হবে। সেটাই কিনব। কিন্তু শুভ্র যেটা দেখে সেটাই তার ভালো মনে হয়, সেটাই পছন্দ হয়। আসলে শিশুতোষ বয়সে পৃথিবীটাকে অনেক সুন্দর মনে হয়। তাদের মনের মাঝে কলুষিত ভাবটা থাকে না বলে তারা সবকিছুকেই সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে।

শুভ্রকে নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ল বাবা-মা। পরে ঠিক করল তারা নিজেরাই পছন্দ করে ছেলের জন্মদিনের পোশাক কিনে নিবে। বিরাট মার্কেটে শুভ্র বাবা-মার সাথে ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল মার্কেটের নিচের ফুটপাতে একটি লোক খাঁচার ভিতর পাখি নিয়ে বসে আছে।

বাবা-মা পছন্দ করে শুভ্রের জন্য পোশাক, নিজেদের জন্য পোশাক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে মার্কেটের নিচে নেমে এল। তখনি শুভ্র বাবার কাছে আবদার করল, বাবা এ বছর জন্মদিনে আমার জামা-কাপড় চাই না, আমাকে কয়েকটা পাখি কিনে দাও। আমি পাখি পুষব।

বাবা তুমি পাখি কোথায় দেখলে?

শুভ্র হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাল।

ঐ যে দেখ লোকটা মার্কেটের ঐ কিনারায় বসে আছে। তার কাছে অনেকগুলো পাখি আছে। লোকটি একটি পাখি বিক্রেতা।

বাবা প্রথমে ছেলেকে বুঝাল, 'দেখ বাবা পাখি পোষা ভালো না। তুমি একজন শিশু। তুমি যেমন উন্মুক্ত পরিবেশে ছুটে বেড়াতে ভালোবাস। হইচই করতে ভালোবাস। ঠিক শিশুদের মনের মতোই পাখিরা মুক্ত ডানায় উড়ে বেড়াতে চায়। ঘুরতে চায়, খেলতে চায়। ওদের আটকিয়ে রাখা ঠিক না।'

কিন্তু শিশু শুভ্র এতটা বুঝতে পারে না। মুখ কালো করে রাখে। মানে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। শুভ্রের মা বাবাকে ইশারা করে বলে, দেখ তোমার ছেলের চোখের মধ্যে পানি, মুখ কালো। আজ তার রাগ ভাঙানো যাবে না যদি পাখি কিনে না দাও।

বাবা তখন বাধ্য হয়েই শুভ্রকে নিয়ে লোকটির কাছে

যায়। শুভ্রকে বলে, তোমার কোন পাখিটা পছন্দ?

শুভ্র হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, ঐ খাঁচার চারটি পাখি আমাকে কিনে দাও। টিয়ে পাখির মতো কিন্তু রংটা অন্যরকম।

লোকটা বলে, এগুলো হলো লাভবার্ড। কথা শিখানো যায়।

বাবা: পাখি চারটার দাম কত পড়বে?

পাখি বিক্রেতা : চার হাজার টাকা।

বাবা : তুমি চারটা পাখি চার হাজার টাকায় বিক্রি করবে?

পাখি বিক্রেতা : ছার, অনেক দূরে থাইক্যা ধইরা আনছি। খরচ পড়ছে বেশি। তাছাড়া ঐ পাখিগুলারে আপনে কথা শিখাইবার পারবেন।

বাবা : আচ্ছা আর মুলামুলি করোনা। তিনহাজার টাকা দিচ্ছি। পাখি চারটি দিয়ে দাও।

লোকটা তখন শুভ্রের হাতে খাঁচাসহ পাখি চারটি তুলে দেয়।

শুভ্র আনন্দ চিত্তে পাখিগুলো নিয়ে সবার আগে গিয়ে গাড়িতে বসে। তারপর বাবা-মা গাড়িতে উঠে বাড়ি চলে আসে।

শুভ্ররা একটি ফ্ল্যাটের তিনতলাতে থাকে। বাড়ি এসে শুভ্র তাদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় পাখির খাঁচাটি ঝুলিয়ে রাখে। এরপর শুভ্র পাখিগুলোর প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ে। এই পাখিগুলো কোন খাবার খায় তা বাবাকে আনতে বলে। সে নিজ হাতে পাখিগুলোকে খেতে দেয়। পাশের ফ্ল্যাটের হুলোটা এসে যেন কোনোরকম বিরক্ত না করে সেদিকেও তার সজাগ দৃষ্টি রয়েছে।

ছেলের এরূপ আচরণ দেখে মা বলে, কি পাখি কিনে দিলে যার জন্য ছেলে অন্য খেলা ভুলে পাখি নিয়েই সময় কাটায়। পড়ায়ও তেমন একটা মন দেয় না।

শুভ্রের বাবা তখন বলে, তোমার জন্যেই তো কিনে দিয়েছি। এখন ছেলে সামলাও। পড়ার দিকে ফিরিয়ে আনো।

রাতে শুভ্র যখন পড়ার টেবিলে বসে আছে। মা তখন কাছে এসে বলে, বাবা তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান, মানিক রতন। আমার চোখের মণি, তোমার বাবার যক্ষের ধন। তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন। তুমি বড়ো হয়ে অনেক শিক্ষিত হবে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে। তোমাকে নিয়ে আমরা গর্ব করব। কিন্তু তুমি যদি পাখি নিয়ে বেশি সময় ব্যয় করো। তাহলে কী হবে?

শুভ্র : কিন্তু মা পাখিগুলোকে দেখাশুনা করতে তো লোক লাগবে।

মা : ঠিক আছে। নিচে যে কেয়ার টেকার শফিক ভাই থাকে। তাকে তোমার বাবা বলে দেবে। সে এসে ঠিকমতো পাখিগুলোকে খাবার-পানি দিয়ে যাবে। তাদের দেখভাল করবে।

শুভ্র : কিন্তু আমি কী করব?

মা : তুমি স্কুল থেকে ফিরে তোমার পাখিগুলোর সঙ্গে সময় কাটাবে। বিকেলটা পার করবে। আবার সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় তাদের সাথে দেখা করে যাবে।

মায়ের কথায় শুভ্র রাজি হয়। এভাবে প্রায় বছরখানিক কেটে যায়।

হঠাৎ ২০২০ সালে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস রোগের সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব পড়ে এই বাংলাদেশেও। শুভ্রদের স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এখন সে একেবারে ফ্ল্যাটে বন্দি। ঘর থেকে বের হতে পারে না। বাবা শুধু একবার বাজারে গিয়ে কিছু সওদা করে ফিরে আসে। সারাদেশেই লকডাউন চলতে থাকে। বাবা বাসা থেকে পিপিই পোশাক পরে অফিসে যায়। আবার ফিরে এসে সে পোশাক সাথে সাথে ধুয়ে ফেলে। এভাবে কয়েক মাস কেটে যায়। চঞ্চল শুভ্র ঘরে থেকে অস্থির হয়ে পড়ে। এখন তার একমাত্র খেলার সঙ্গী হয়ে ওঠে সেই পাখি চারটি। তাদের নিয়েই এখন আবার তার সময় কাটতে থাকে।

শুভ্ররা যে ফ্ল্যাটে থাকে। তার পাশেই বেশ কয়েকটা ফলের গাছ ছিল। শুভ্র খেয়াল করে দেখে, আগে এসব গাছে কোনো পাখি দেখা যায়নি।

কিন্তু লকডাউনে লোকজনের উপস্থিতি কম হওয়াতে, রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য হওয়াতে সেসব গাছে অনেক পাখির আগমন ঘটছে। তাদের ফ্ল্যাটের পাশের গাছগুলোতে কোনো সবুজ লতাগুল্ম ছিল না। কিন্তু ইদানিং বেশ কয়েকটা লতা গাছের কাণ্ড বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে অতি দ্রুত। ফুল গাছেও ফুলের সমারোহ দেখা যাচ্ছে। মৌমাছি আর প্রজাপতি সেই ফুলের মধু খেতে গুনগুন করে গান করছে। কী সুন্দর একটা পরিবেশ লক্ষ করা যাচ্ছে প্রকৃতিতে! ফ্ল্যাটের তিন তলায় দাঁড়িয়ে শুভ্র প্রতিদিনই এসব দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়।

কারখানার কালো ধোঁয়াবিহীন গাড়ির মাত্রাতিরিক্ত হর্নের শব্দবিহীন আর যানজটহীন শহরটাকে অপরূপ সৌন্দর্য এনে দিয়েছে সবুজের মনকাড়া ঘাস আর লতাগুল্মের সমারোহ। শুভ্র ভাবে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কত সুন্দর!

রাতে বিছানায় শুয়ে শুভ্র ভাবে, আমাদের ফ্ল্যাটের আশেপাশে কোনো পাখি দেখিনি এতদিন। কিন্তু এখন সকালে ওদের মধুর সুরে কিচির মিচির ডাকে ঘুম ভাঙে। তবে আমার খাঁচায় বন্দি পাখিগুলো কিন্তু এভাবে ডাকে না। তাহলে কি ওরা বন্দি বলে? আজ ওরা মুক্তভাবে থাকলে কত সুন্দর এ ডাল ও ডাল ঘুরে নেচে বেড়াত। আর মুক্ত বাতাসে ডানা মেলে আকাশের পানে উড়ে বেড়াত। ওদের কলকাকলিতে মানুষের ঘুম ভাঙত।

শিশুতোষ মনে কিছু অন্যায় চোখে পড়লে তারা সেটা অনুভব করতে পারে। লকডাউনে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে শুভ্রের বেলায়ও তাই ঘটল। আপন মনেই শুভ্র বলতে লাগল, না না এটা অন্যায়। পাপ কাজ! বাবা ঠিকই বলেছে, যাকে যেখানে মানায় সেখানেই থাকা উচিত। ওদের খাঁচায় রাখাটা মোটেও উচিত হয়নি। আমি কালই বাবাকে বলে খাঁচার পাখি চারটিকে ছেড়ে দিব ওদের ঠিকানায়।

পরদিন ভোরে উঠে শুভ্র বাবাকে ডেকে তোলে। কি জন্য ডাকা হয়েছে তিনি তা বুঝতে পারেন না। বলে, অফিসের কাজ সেরে অনেক রাতে ঘুমিয়েছিতো। তাই ঘুম থেকে উঠতে দেরি হচ্ছে। কি জন্য ডাকছ বাবা?

শুভ্র: বাবা আজ তোমাকে আর মাকে একটি কথা বলব।

বাবা: কী কথা?

শুভ্র: বাবা তুমি যেদিন আমি পাখি কিনেছিলাম সেদিন বলেছিলে, পাখিদের খাঁচায় পুষতে নেই। সেটাই ঠিক। মাও বলতো পাখিদের বন্দি করে রাখতে নেই। সত্যিই বাবা কথাটা ঠিক, 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা-মাতৃক্রোড়ে।'

ছেলের শুভবোধ হওয়াতে বাবা আগ্রহ দেখিয়ে বলল, তা এতদিনে তুমি একথা কীভাবে বুঝলে?

শুভ্র: প্রকৃতি মানুষকে অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। এই লকডাউনে আমাদের ফ্ল্যাটের পাশের ফলগাছগুলোতে অনেক পাখির ডাক আমি শুনেছি। তারা সকালে ডেকে ওঠে মানুষের ঘুম ভাঙায়। কিন্তু আমার খাঁচার পাখিগুলোকে এভাবে আনন্দে ডাকতে দেখিনি। তাহলে কি ওরা বন্দি বলেই আনন্দ প্রকাশ করতে পারছে না? কয়েকমাস যাবত এই জিনিসটি আমি লক্ষ করছি। তাই পাখি চারটিকে আমি বন্দি জীবন থেকে মুক্তি দিতে চাই।

মা: তোমার পোষা পাখি তুমি মুক্ত করে দিবে। তাতে আমাদের আপত্তি কি?

শুভ্র: তাহলে চলো আমরা তিনজন পাখি চারটি নিয়ে ফ্ল্যাটের ছাদে গিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়ে আসি।

তখন শুভ্র খাঁচার পাখি চারটি নিয়ে বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে ফ্ল্যাটের ছাদে গিয়ে উঠল। এক বছর যাবত পালা আদরের পাখি চারটি ছেড়ে দিচ্ছে। তাই শুভ্রের মনটা আজ ভারাক্রান্ত আর চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত। তবুও আজ তার ভালো লাগছে পাখিগুলোকে মুক্ত করে দিয়ে।

শুভ্র বাবার দিকে তাঁকিয়ে বলে, এই পাখিগুলো তো কোনো পাখির বাচ্চা। আবার ওদেরও তো বাচ্চা আছে। তা রেখে ওদের ধরে আনা হয়েছে। এটা কিন্তু পাখি বিক্রেতারা ঠিক করেনি। ওদের পুলিশে ধরিয়ে দেয়া উচিত।

শুভ্রের কথায় বাবা-মা উভয়েই খুশি হয়।

শুভ্র প্রথম পাখিটাকে বের করে বাবার হাতে দিয়ে বলে, বাবা তুমি ওকে প্রথম ছেড়ে দাও। বাবা পাখিটাকে ছেড়ে দেয়।

তারপর দ্বিতীয় পাখিটাকে মায়ের হাতে দিয়ে বলে, মা তুমি ওটাকে ছাড়। মা ছেড়ে দেয়। এরপর একে একে আর দুটোকে নিজ হাতে তুলে নেয়। আদর করে শরীরে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে ছেড়ে দেয়।

পাখিগুলো ছাড়া মাত্রই মহানন্দে ফুরুৎ করে মুক্ত বাতাসে ডানা মেলে উড়ে গেল। যেন ওরা ওদের নীড় খুঁজে পেয়েছে। পাখিগুলোর আনন্দ দেখে, ভারাক্রান্ত মন ও অশ্রুসিক্ত চোখ সত্ত্বেও শুভ্র করতালি দিয়ে বলে ওঠে, দেখেছ বাবা, মুক্ত মনে উড়ে বেড়ানোর স্বাদই আলাদা। নিমিষেই ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল ওদের আসল ঠিকানায়। ওদের মুক্ত করতে পেরে আমারও আনন্দ লাগছে।■

সরকারি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার

রূপকথার গল্প

রহস্যময়ী রাজকন্যারা

সাজেদ ফাতেমী

এক দেশে এক রাজার বারোটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে ছিল। কাজকর্মে ও কথায় তারা ছিল ভীষণ রহস্যময়ী। তারা সবাই একটি ঘরে আলাদা বিছানায় ঘুমাতো। ঘুমাতে যাওয়ার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতো। কিন্তু তারা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তাদের জুতাগুলো দেখে বাড়ির লোকজন অবাক হতেন। জুতাগুলো এমন উষ্ণ ও এলোমেলো হয়ে থাকে যে মনে হয় তারা সেগুলো পড়ে সারারাত নেচেছে। কেউই বুঝতে পারত না এর রহস্য কী অথবা রাজকন্যারা গভীর রাতে কোথায় যায়।

তাই রাজা একদিন ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি এই রহস্য উদঘাটন করতে পারবে অর্থাৎ প্রতি রাতে তার মেয়েরা কোথায় নাচতে যায়, তা খুঁজে বের করতে পারবে—সেই ব্যক্তি রাজকন্যাদের যাকে পছন্দ করবে তাকেই বিয়ে করতে পারবে। তিনি আরো ঘোষণা দেন, তার মৃত্যুর পর ওই ব্যক্তিই দেশের রাজা হবে। কিন্তু তিন দিন তিন রাত চেষ্টার পরও যিনি এই রহস্য উদঘাটন করতে পারবে না, তাকে মেরে ফেলা হবে। ঘোষণা শুনে অন্য এক রাজার একটি ছেলে এল। সে খুব মজা করতে জানত। রাজকন্যারা রাতের কোন সময়টাতে বাইরে যায়, তা দেখার জন্য একদিন তাকে তাদের ঘরে এনে একটি খাটের নিচে লুকিয়ে রাখা হলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার ভীষণ ঘুম পেল। অনেক চেষ্টা করেও নিজের ঘুম আটকাতে পারল না ছেলেটি। এক ঘুমে রাত পার। ভোরবেলা উঠে দেখে, রাজকন্যাদের সকলেই নাচছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতেও একই ঘটনা ঘটল। আসল কাজ

করতে না পারায় রাজা ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে ছেলেটির মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

এভাবে আরো কয়েকজন এলেন রাজকন্যারা রাতের আঁধারে কোথায় যায়, সেই রহস্য ভেদ করার জন্য। কিন্তু কেউই পারলেন না। তাই তাদের সবার পরিণতি একই হলো।

একদিন এক মাঝবয়সি সৈনিক ওই রাজার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক বৃদ্ধার সঙ্গে তার দেখা হয়। সৈনিক কোথায় যাচ্ছেন জানতে চান বৃদ্ধা। তিনি বললেন, 'আমি রাজার একটি ঘোষণা শুনে তার বাড়িতেই যাচ্ছি। তার মেয়েরা প্রতি রাতে কোথায় নাচতে যায়, তা খুঁজে বের করতে পারলে আমি রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পারব এবং রাজা হতে পারব'।

বৃদ্ধা বললেন, 'ভালো। এটি খুব কঠিন কাজ নয়। তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন, রাজকন্যাদের একজন বিকেলবেলা আপনাকে পানীয় খেতে দেবে। তা আপনার খাওয়া যাবে না। আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে। কাজটি হলো, আপনি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভিনয় করবেন।' এরপর তিনি সৈনিককে একটি ঢিলেঢালা ছদ্মবেশ দিলেন। বললেন, রাজকন্যাদের খোঁজা শুরু করার আগে এটি পরে নেবেন। দেখবেন আপনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আর তখন রাজকন্যারা কখন কোথায় গেল, তা খুঁজে বের করা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

সৈনিক এতক্ষণ বৃদ্ধার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য হলেও বৃদ্ধার সব কথা তাকে শুনতে হবে। বৃদ্ধার কথামতো সোজা রাজার কাছে চলে গেলেন তিনি। রাজাকে বললেন, 'হুজুর আমি আপনার ঘোষণা শুনেই এসেছি। আপনার মেয়েরা রাতেরবেলা কে কোথায় যায়, তার সব ব্যাপারে আমি খবর এনে দিতে পারব।'

সৈনিকের কথা শুনে রাজা বললেন, ঠিক আছে আপনার কাজ শুরু করে দিন।

সন্ধ্যাবেলা রাজকন্যাদের ঘরে গিয়ে লুকানোর মুহূর্তে রাজকন্যাদের সবচেয়ে বড়োজন এক গ্লাস পানীয় হাতে নিয়ে এল সৈনিকের কাছে। তিনি কাপটি হাতে নিলেন, তবে তা পান না করে লুকিয়ে ঘরের এক কোণায় ফেলে দিলেন। তারপর তিনি খাটের নিচে শুয়ে পড়লেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমানোর ভান করে ভীষণ জোরে জোরে নাক ডাকতে শুরু করলেন। নাক ডাকা শুনে রাজকন্যারা হাসতে লাগল।

এবার তারা তাদের আসল কাজ শুরু করে দিলো। ড্রয়ার খুলে সবাই তাদের সুন্দর সুন্দর পোশাক খুঁজে বের করল। তারপর সেগুলো পরে সাজুগুজু করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুশিতে বাকবাকুম করতে লাগল— যেন এখনই তারা নাচ শুরু করবে।

বোনদের এত উচ্ছ্বাস দেখে ভালো লাগল না ছোটো রাজকন্যার। সে বলল, তোমাদের এত খুশি দেখে কেন যেন আমার অস্বস্তি লাগছে। আমি নিশ্চিত আজ আমরা কোনো বিপদে পড়ব। তোমরা অনেক দুর্বল মনের মেয়ে। সব সময় একটা ভয়ের মধ্যে থাকো।

ছোটো বোনের এসব কথায় কেউ পাত্তা দিলো না। তারা ধীরে ধীরে সৈনিকের কাছে গেল। গিয়ে দেখে বেচারা গভীর ঘুমে। তাকে এ অবস্থায় দেখে সবাই নিজেদের নিরাপদ ভাবল। তারা নিশ্চিন্ত মনে একে একে ঘরের মেঝেতে তৈরি করা গোপন দরজা দিয়ে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যেতে লাগল। সেখানে এক বিশাল সুড়ঙ্গ তৈরি করা আছে। সুড়ঙ্গের দৃশ্যও ভীষণ সুন্দর।

সৈনিক এবার চোখ খুলে সবার চলে যাওয়া দেখলেন। তিনি ভাবলেন, তার আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। খাটের নিচ থেকে বের হয়ে সেই বৃদ্ধার দেওয়া গাউনের মতো ছদ্মবেশটি পরে রাজকন্যাদের অনুসরণ শুরু করলেন।

সবাই নিচে গিয়ে সেখানকার নানান দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সুন্দর সুন্দর অনেক গাছ, সেসব গাছের মিষ্টি কচি পাতা– সবই দারুণ লাগছে। বৃদ্ধ সৈনিকও এসেছেন এখানে। কিন্তু ছদ্মবেশ পরে আসায় তিনি অদৃশ্যই থেকে যাচ্ছেন। কেউ তাকে দেখতে পারছে না, অথচ তিনি সবাইকে দেখছেন। তাঁর ইচ্ছে হলো ফিরে যাওয়ার সময় এখানকার কিছু নিদর্শন নিয়ে যাওয়ার। তিনি একটি গাছের একটি পাতা ছিড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে একটি বিকট আওয়াজ এল। তখন ছোটো রাজকন্যা বলল, আমি নিশ্চিত কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। আচ্ছা, তোমরা কি ওই আওয়াজ শুনতে পাওনি? এমন শব্দ কিন্তু আগে কোনোদিন শোনা যায়নি।

বড়ো রাজকন্যা বলল– এটি আর কিছু নয়, আমাদের সকলের সম্মিলিত চিৎকার- চেঁচামেচি থেকেই তুমি ও রকম শব্দ শুনতে পাচ্ছো।

এবার তারা আরেকটি তরুবীথির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। এই গাছটির সব পাতা হালকা সোনালি রঙের। পাশের গাছটির কাছে গিয়ে দেখল এর পাতাগুলো হীরার মতো ঝলঝল করছে। সৈনিক প্রতিটি গাছ থেকে একটি করে পাতা ছিঁড়ে নিলেন। এদিকে মাঝেমধ্যেই ওই বিকট আওয়াজটি শোনা যাচ্ছে। এতে ছোটো রাজকন্যার ভয় বেড়ে গেল। কিন্তু বড়ো রাজকন্যা এবারো ছোটো'র ভয়কে পাত্তা দিলো না।

রাজকন্যারা তরুবীথির কাছ থেকে সরে গিয়ে কিছুটা দূরে অবস্থিত একটি বড়ো লেকের কাছে দাঁড়ালো। সেখানে তারা দেখতে পেল, বারোটি ছোট্ট নৌকা নিয়ে বারোজন রাজপুত্র অপেক্ষা করছে। এবার একেকজন রাজকন্যা একেকটি নৌকায় উঠল। সৈনিক উঠলেন সবচেয়ে ছোট্ট রাজকন্যার নৌকায়। তিনি অদৃশ্য হয়ে আছেন বলে ছোটো রাজকন্যা কিছুই বুঝতে পারল না। রাজপুত্রেরা নৌকা ভাসিয়ে দিলো। নৌকা ভাসতে ভাসতে কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল একটি সুন্দর বাড়িতে আলো ঝলমল করছে। সেখান থেকে গানবাজনা ও হইচই শোনা যাচ্ছে। গানবাজনা শুনে তারা সবাই নৌকা থেকে নেমে সুন্দর বাড়িটিতে ঢুকে গেল। সেখানে গিয়ে আর নিজেদের স্থির রাখতে পারল না। রাজকন্যারা একেকজন রাজপুত্রের সঙ্গে নাচ শুরু করে দিলো। সৈনিকও ওদের সঙ্গে নাচতে লাগলেন। তার সুবিধা হলো কেউ তাকে দেখতে পারছে না।

এবার রাজকন্যারা ওয়াইন পানের জন্য টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারা একের পর এক গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে রাখছে, আর সৈনিক তা ঢকঢক করে খেয়ে ফেলছেন। একটু পরেই তারা গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে দেখে কোনো গ্লাসেই ওয়াইন নেই! সব যেন হাওয়া হয়ে গেল! ব্যাপারটা কী? ছোটো রাজকন্যা ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল। তার কিছুটা ভয়ও হলো। কিন্তু অন্যরা এবারও ছোটো'র ভাবনা বা ভয় কোনোটাকেই পাত্তা দিলো না।

তারা সবাই নাচতে শুরু করে দিলো। ভোর পর্যন্ত নাচল। এরই মধ্যে তাদের জুতাগুলো গরম হয়ে গেছে। এবার ফেরার পালা। রাজকন্যা ও রাজপুত্ররা সবাই একে একে নৌকায় উঠে বসল। সৈনিক এবার উঠলেন বড়ো রাজকন্যার নৌকায়। কিন্তু ওই আগের মতোই অদৃশ্য অবস্থায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা চলে এল তীরে। রাজকন্যারা নেমে এল। তাদের নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল রাজপুত্ররা। যাওয়ার আগে তারা আবার কাল আসার কথা জানালো। নৌকা থেকে দ্রুত নেমে নিজ শয়নকক্ষের দিকে দৌড় দিলেন সৈনিক। তিনি বিছানার নিচে শুয়ে নাক ডাকতে শুরু করলেন। রাজকন্যারাও ঘরে ফিরে পোশাক বদল করে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। এমন সময় তারা সৈনিকের নাক ডাকা শুনতে পেলো। শব্দ শুনে রাজকন্যারা নিশ্চিত হলো যে তাদের আর কোনো ভয় নেই।

পরদিন সকালে উঠে সৈনিক ভাবলেন একদিনেই সবকিছু নিশ্চিত হওয়া যাবে না। তাই গতরাতের মতো আবারও যেতে হবে ওই রোমাঞ্চকর ভ্রমণে।

তাই পরপর আরও দুদিন সেখানে গেলেন। দেখলেন রাজকন্যারা তাদের জুতা গরম না হওয়া পর্যন্ত ঠিক একইভাবে রাজপুত্রদের সঙ্গে নাচলেন এবং বাড়ি ফিরলেন। তৃতীয় রাতে সৈনিক একটি কাজ করলেন। তিনি যে রাজকন্যাদের নাচের আসরে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ হিসেবে ওই আসর থেকে গোপনে একটি সোনার কাপ নিয়ে এলেন।

এবার তিনি ভাবলেন সত্যিটা প্রকাশের সময় এখনই। তিনি তরুবীথির ছিঁড়ে আনা তিনটি পাতা ও সোনার কাপটি নিয়ে রাজার সামনে হাজির হলেন। বারোজন রাজকন্যাও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলেন সৈন্যের কথা শুনতে।

এবার রাজা জিজ্ঞেস করলেন- 'হে সৈনিক বলো, রাজকন্যারা প্রতি রাতে কোথায় নাচতে যায়?' সৈনিক বললেন, রাজকন্যারা প্রতিরাতে তাদের ঘরের মেঝের নিচে একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে দূরের একটি আলো ঝলমলে বাড়িতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বারোজন রাজপুত্রের সঙ্গে রাতভর নেচে ভোরবেলা বাড়ি ফিরে আসে। এ কথা বলে তিনি রাজাকে তরুবীথির তিনটি পাতা ও সোনার কাপটি দেখালেন। তিনি বললেন, 'হুজুর, এগুলোই হচ্ছে তার প্রমাণ'। একথা শুনে বিস্মিত রাজা কন্যাদের ডাকলেন। তিনি তাদের কাছে সৈনিকের কথার সত্যতা জানতে চাইলেন।

রাজকন্যারা তো এবার নিরুপায়। সৈনিকের তথ্য-প্রমাণের একটিও অস্বীকার করার সাহস তারা পেল না। এই সৈনিক কীভাবে তাদের সব খবরাখবর পেল, তা ভেবে অবাক হয়ে গেল রাজকন্যারা। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করারও সাহস পেল না।

সৈনিকের কথা শুনে রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন- 'হে সৈনিক, তোমার জয় হয়েছে। এবার আমার কথা রাখার পালা। তুমি বলো কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাও?'

সৈনিক একটু চিন্তা করে বললেন, 'হুজুর আমার বয়স মোটেই কম নয়। সেই কথা বিবেচনা করে আমি বড়ো রাজকন্যাকেই বিয়ে করতে চাই।'

রাজা বললেন, 'তবে তাই হবে। এই... তোমরা কে কোথায় আছো, রাজকন্যার বিয়ের ঢোল বাজাও... আজ আমার সবচেয়ে খুশির দিন।' রাজা বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর তুমিই হবে রাজা।' একসঙ্গে এত বড়ো দুটি খুশির খবর শুনে সৈনিক এবার আনন্দে কেঁদে ফেললেন।■

জনসংযোগ পরিচালক, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি

গল্প

লাল পাতার নৌকা

জহির টিয়া

বিশাল এক ল্যাংড়া আমের গাছ। বাগানের সবচেয়ে বড়ো গাছ। ফজলি, আশ্বিনা, গোপালভোগ, ক্ষিরশেপাতি সবগাছকে ছাড়িয়ে গেছে। শাখা-প্রশাখায়। সেই গাছের মগডালে বাস করে একটা লাল পাতা। টুকটুকে লাল। সিঁদুর রাঙা। কিন্তু সবুজ সবুজ পাতাদের মাঝে একটা লাল পাতা ! সবুজ পাতারা মেনে নিতে পারে না। এত্ত এত্ত সবুজ পাতার ভিড়েও লাল পাতার রূপ সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সবাইকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে। লাল পাতাকে দেখতে দলে দলে প্রজাপতিরা আসে। ফড়িঙেরা আসে। পাখপাখালিরা আসে। ভিমরুল, বোলতা, মাছি, পিপীলিকাসহ আরও কত কীটপতঙ্গ !

একদিন সবুজ পাতারা গোপনে মিটিং করল। যেভাবে-ই হোক লাল পাতাকে গাছ হতে তাড়াতে হবে। এমন কী এই বাগানেও থাকতে দেবে না। সত্যি সত্যিই একদিন একেবারে ভোরবেলায় ঘটিয়ে দিলো তুলকালাম কাণ্ড। সবুজ পাতারা হুর-রা দিয়ে উঠল। তখনও সূর্য রূপ মেলে ধরেনি পৃথিবীতে। ঘুম ভাঙেনি লাল পাতার। ঘুম ভাঙেনি পাখিদের। এমন কী প্রজাপতি, ফড়িং, ভিমরুল, বোলতা, মাছি, পিপীলিকা কারও ! ঝনঝন, শনশন বেগে সবুজ পাতারা হামলা করল লাল পাতার বাসায়। সবুজ পাতাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল লাল পাতার। ঘুম ভাঙল অন্যান্য সবার। লাল পাতা দরজা খুলে বাইরে আসতে-ই সবুজ পাতাদের দমকা হাওয়াতে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কিছু না বোঝার আগেই উড়িয়ে নিয়ে গেল দমকা হাওয়ায়। লাল পাতা উড়তে উড়তে উড়তে... গিয়ে পড়ল এক নদীর ওপর। নদীর জলে দুলতে লাগল ঢেউয়ের তালে তালে। কিছুটা পথ যেতেই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ডাক দিলো একটা দোয়েল পাখি।

'ও নৌকা ভাই...। আমারে কি তোমার নৌকায় নেবে? কোনোদিন চলন্ত নৌকায় চড়ে দোল খাইনি।'

লাল পাতা কোনো উত্তর করল না। আর করবেই বা কেন? সে কি জানে যে– সে এখন নৌকা হয়ে গেছে! আবার ডাক দিলো দোয়েল।

'ও লাল পাতার নৌকা। আমাকে তোমার নৌকায় নাও না। আমাকে চিনছ না? আমি জাতীয় পাখি দোয়েল। প্রতিদিন ভোরে শিস দিয়ে তোমার ঘুম

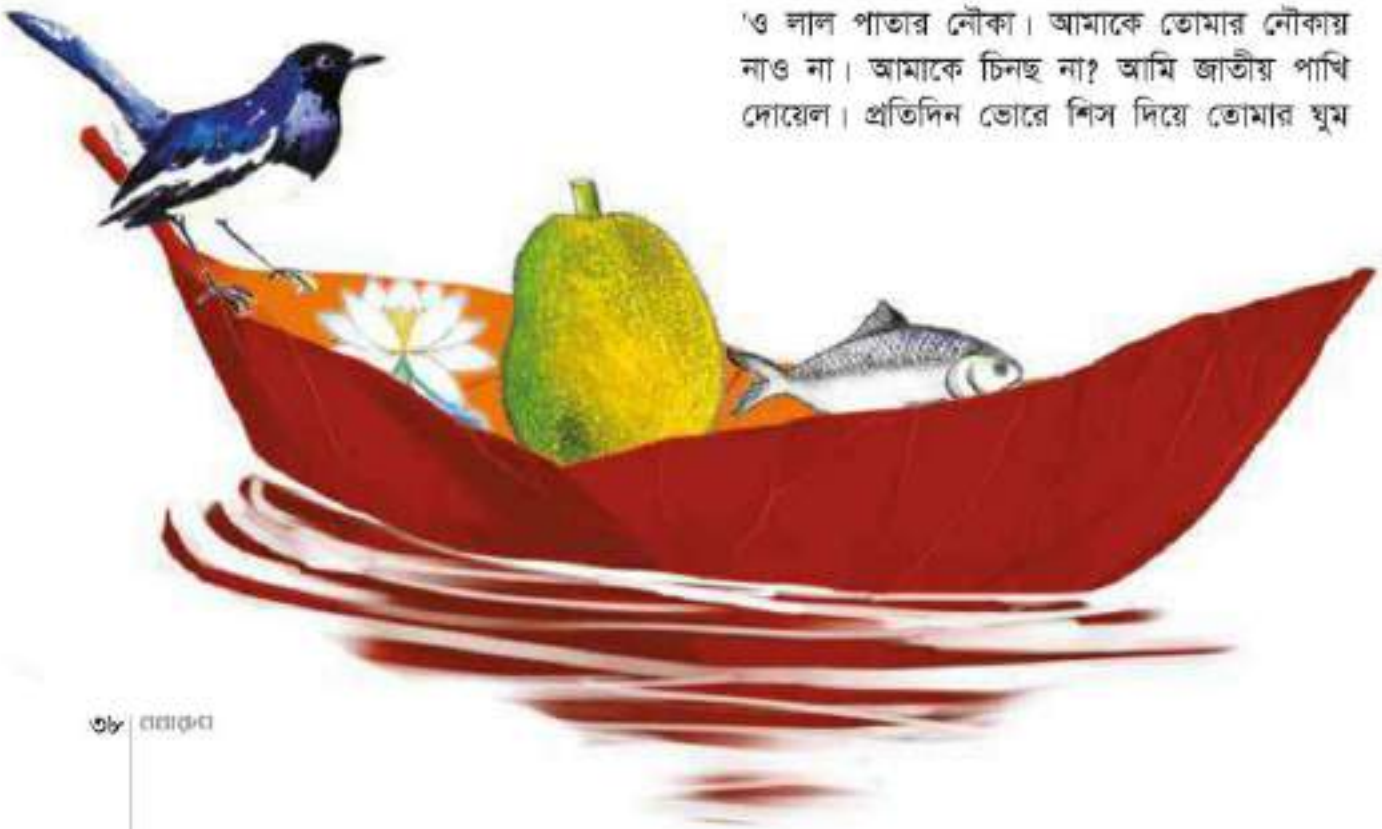

ভাঙাতাম না ! আমি সে-ই দোয়েল। নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর বহু দিনের ইচ্ছে।'

লাল পাতার নৌকা বলায়, এবার লাল পাতা ঘুরে দেখল। তারপর দোয়েলকে বলল, 'ও দোয়েল ভাই। আমি তো সামান্য লাল পাতা। নৌকা হলাম কবে যে– তোমায় নিয়ে নদীতে দুলব। তোমার ভার কি আমি সইতে পারব?

'আরে ভাই লাল পাতা...! তুমি গাছ হতে আসার পর, নদীতে পড়েই নৌকা হয়ে গেছ।'

'তাই নাকি ! আমি তো লক্ষ করিনি।' বলেই লাল পাতা মুখ তুলে তার পেছন দিকে তাকাল। লাল পাতা নিজেকে নিজে দেখেই অবাক ! বলে উঠল– এ কী! সত্যিই তো ! লাল পাতা দেখে– তার দেহটা একটা ছোটো ডিঙি নৌকার মতোন হয়ে গেছে। তাতে লগি, বৈঠা, মাস্তুল সবই আছে। লাল পাতা মনে মনে ভীষণ খুশি হলো। আর খুশিতে ডগমগ হয়ে দোয়েলকে ডাক দিয়ে বলল, 'দোয়েল ভাই, চলে এসো আমার নৌকায়।' দোয়েল উড়ে গিয়ে বসল লাল পাতার নৌকার ওপর। লাল পাতার নৌকা চলতে লাগল ঢেউয়ের তালে হেলে-দুলে। আর দোয়েল পাখি মিষ্টি সুরে শিস বাজাতে লাগল।

কিছু দূর আসতে নদীর কিনারে পানিতে ফুটে থাকা সাদা শাপলা ডাক দিয়ে বলল, 'ও লাল পাতার নৌকা ভাই। আমি জাতীয় ফুল শাপলা। আমাকে তোমার নৌকায় নেবে না? আমার অনেক দিনের শখ, নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর।'

লাল পাতার নৌকা হেলতে-দুলতে শাপলার কাছে গেল। তারপর তাকে নৌকায় ওঠিয়ে নিল। দোয়েল আর শাপলাকে নিয়ে চলতে লাগল লাল পাতার নৌকা। দোয়েল পাখি মিষ্টি সুরে শিস বাজায় আর শাপলা মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে নাচে। ঢেউয়ের তালে তালে ধীরগতিতে চলছে লাল পাতার নৌকা। নদীর কিনার ঘেঁষে। কিছু দূর যেতেই ডাক দিলো একটা কাঁঠাল। নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মাঝারি আকারের কাঁঠাল গাছে ঝুলছিল সে।

কাঁঠাল বলল, 'ও নৌকা ভাই। লাল পাতার নৌকা। আমি জাতীয় ফল কাঁঠাল। আমাকে তোমার নৌকাতে নিয়ে যাও। তোমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে চাই। একা একা গাছের ডালে ঝুলে থাকতে ভালো লাগছে না।'

লাল পাতার নৌকা কাঁঠাল গাছের কাছে ভিড়ল। এরপর তরতরিয়ে নেমে এল কাঁঠাল। ওঠে বসল নৌকাতে। সে নৌকাতে চড়তেই দুলে উঠল নৌকা। ভয় পেল- দোয়েল আর শাপলা ! তাদের অভয় দিয়ে নৌকা বলল, 'তোমরা ভয় করো না। আমি ডুবব না।'

লাল পাতার নৌকা চলতে চলতে একটা বড়ো নদীতে চলে গেল। সেখানে বাস করত একটা ইলিশ মাছ।

সেও লাল পাতার নৌকাকে দেখে আবদার করে বসল। খুব চিকন গলায় ইলিশ বলল, 'নৌকা ভাই। ও লাল পাতার নৌকা ভাই। আমি জাতীয় মাছ ইলিশ। আমাকে কি তোমার নৌকায় নেবে?' লাল পাতার নৌকা হাসিমাখা মুখে বলল, 'কেন নেব না? এসো ইলিশ ভাই, এসো।' এক লাফে নৌকার ওপর উঠে পড়ল ইলিশ। তারপর তিড়িং বিড়িং শুরু করে দিলো সে। দোয়েল, শাপলা, কাঁঠাল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সবাই একসাথে বলে উঠল, 'ও নৌকা ভাই। ওকে নৌকা হতে নামিয়ে দাও। ও যেমন শুরু করেছে, তাতে তো আমরা সবাই ডুবে মরব।'

লাল পাতার নৌকা বলল, 'ও জীবনের প্রথম পানি ছাড়া নৌকায় ওঠেছে। তাই একটু আনন্দে নাচানাচি করছে। করতে দাও। তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি সহজে ডুবব না। দেখছ না, কেউ ওঠার সাথে সাথেই আমার শরীরটা কেমন বড়ো হয়ে যাচ্ছে।'

লাল পাতার নৌকা আপন মনে চলতে লাগল। আর দোয়েল, শাপলা, কাঁঠাল, ইলিশ মনের সুখে নেচে নেচে গান গাচ্ছে। এমন সময় নদীপাড়ের একটা ছোটো জঙ্গল হতে একটা বাঘ ডাক দিলো।

'ও নৌকা ভাই। লাল পাতার নৌকা। আমি জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আমাকে তোমার নৌকাতে নাও না। নৌকাতে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর বহুদিনের স্বপ্ন।'

বাঘের কথা শুনে সবাই নৌকাতে উঠতে মানা করল। কিন্তু নৌকা সবাইকে অভয় দিয়ে বাঘের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর অমনি বাঘ লাফিয়ে নৌকাতে পড়তেই- নৌকা ডুবতে লাগল। সবাই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। সবাই কোনো রকমে সাঁতরে তীরে উঠে এল। আর লাল পাতার নৌকাও ধীরেধীরে ভেসে ওঠল। লাল পাতার নৌকা তার ভুল বুঝতে পারল। অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।■

শিক্ষক, দক্ষিণ সাধিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

আয়ান হক, ২য় শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

পাহাড়িয়া ঐতিহ্যে পেদা টিং টিং

আরমান হোসেন দেওয়ান

পার্বত্য অঞ্চল যেন বাংলাদেশের মাঝেই আরেকটি দেশ। এই এলাকার ভূপ্রকৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ভাষা সবকিছুই আলাদা। আছে সহজ-সরল ও বৈচিত্রপূর্ণ জীবনযাত্রা। তাদের খাদ্যও অন্যরকম। বাঙালিদের সাথে পাহাড়িদের খাদ্যের বেশ পার্থক্য। তাদের খাবারের প্রতি বাঙালিদের শুরু থেকেই আছে নানা কৌতূহল। খাবারগুলো কিন্তু বেশ আর্কষণীয় ও সুস্বাদু। বাঙালির খাবারে খুব বেশি তেল-মশলা থাকলেও পাহাড়িরা খাবারে খুব কম তেল-মশলা ব্যবহার করে। খাবার রান্নার উপকরণেও রয়েছে বেশ ব্যবধান। বন্ধুরা, জেনে নেই কিছু মজার খাবারের কথা–

বাঁশ কোড়ল: পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের প্রিয় খাবার বাঁশ কোড়ল। কচি বাঁশ দিয়ে রান্না করা হয় এটি। চাকমা ভাষায় এটি বাচ্ছুরি, মারমা ভাষায় মহই। স্যুপ, মুক্তি, মাংস দিয়ে বা শুধু ভাজি করেও এই খাবার খাওয়া হয়। বর্ষার শুরুতে নরম মাটিতে বাঁশ গজাতে শুরু করে। তখনি এই বাঁশ কোড়ল খাওয়া হয়। শুধুমাত্র বর্ষাতেই এটি পাওয়া যায়।

ব্যাম্বু চিকেন: পাহাড়ের একটা জনপ্রিয় খাবার হলো সুমো হুরো এরা বা ব্যাম্বু চিকেন। বাঁশের মধ্যে রান্না করা হয় বলেই এর নাম ব্যাম্বু চিকেন। পাহাড়ে গেলে এ স্বাদ সবাই নিয়ে থাকে। দেশি মোরগের সাথে আদা, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, সাবারাং পাতা মিশিয়ে কাঁচা বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে কলাপাতা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় বাঁশের মুখ। তারপর কয়লা দিয়ে রান্না করা হয় ব্যাম্বু চিকেন। আগুনে দিয়ে বাঁশটি চারপাশে ঘুরিয়ে ভেতরের খাবারগুলো সিদ্ধ করতে হয়। এ রান্নায় কোনো পানি দিতে হয় না। কাঁচা বাঁশের যে পানি থাকে তা দিয়েই রান্না হয়ে যায়। স্বাদ হয় পাতিলে রান্নার চেয়ে দ্বিগুণ।

ব্যাম্বো চা ও কফি : সবার কাছে খুব জনপ্রিয় ব্যাম্বো চা। এই চা বা কফিতে আগ্রহ বেশি হয় কারণ বাঁশের চোঙায় চা বা কফি পরিবেশন করা হয়। প্রথমে বাঁশের চোঙার ভেতর দুধ, চিনি দেওয়া হয়। এরপর চায়ের লিকার দিয়ে লুইসাইদের তৈরি এক ধরনের কাঠি দিয়ে নাড়িয়ে তৈরি হয় ব্যাম্বো চা বা কফি। এটির স্বাদও অন্য চায়ের থেকে আলাদা।

মুণ্ডি: পাহাড়িরা নিজস্ব পদ্ধতিতে চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি করে নুডলস বা মুণ্ডি। এই মুণ্ডি মুরগি বা মাছের স্টেকের সাথে খাওয়া হয়। মুণ্ডি তৈরি করতে চালকে ১৫ দিনের মতো ভিজিয়ে রাখতে হয়। এই ভেজানো চালকে ছোটো ছিদ্র যুক্ত চালনিতে করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকানো হয়। এরপর ঢেঁকিতে পিষে মণ্ড তৈরি করা হয়। এই মুণ্ডি বানাতে লাগে একটি বিশেষ যন্ত্র। তারপর এই মণ্ডকে বিশেষ যন্ত্র দিয়ে চাপ দিলে নিচে চলে আসে নুডলস-এর মতো চিকন লম্বা মুণ্ডি। মশলা, শুঁটকি মাছ, ধনিয়া পাতা দিয়ে এই খাবার পরিবেশন করে তারা।

হেবাং: চাকমাদের আরেকটি প্রিয় খাবার হলো শুঁটকি মাছ। আমাদের রান্নায় আমরা যেমন লবণ ব্যবহার করি ওরাও তেমনি রান্নায় শুঁটকি মাছ ব্যবহার করে। অনেক ধরনের শুঁটকি মাছ দিয়ে চুলায় ভাপে রান্না করা হয় হেবাং। হেবাং একটি রান্নার পদ্ধতি। শুঁটকি মাছ ছাড়াও মাংস দিয়েও হেবাং রান্না করা হয়। হেবাংকে এলাকাবাসী সুগনি হেবাংও বলে।

নাপ্পি: কক্সবাজারের রাখাইন পল্লিতে নাপ্পির খুব প্রচলন। সমুদ্রের ছোটো চিংড়িকে তারা মিম ইছা বলে। মিম ইছা রোদে শুকিয়ে লবণ অন্যান্য সামুদ্রিক ছোটো মাছের গুড়া ও বিভিন্ন মশলা দিয়ে নাপ্পি তৈরি করে। এটি শুঁটকির মতো রান্না করে তারা আবার অন্যান্য খাবারের সাথেও দিয়ে রান্না করে।

শামুক ও ঝিনুক: পাহাড়িরা আমিষের চাহিদা মেটাতে শামুক ও ঝিনুক খেয়ে থাকে। তারা প্রায় সবদিনই এই খাবার খেয়ে থাকে। এই শামুক ও ঝিনুক বেশ মজা করেই রান্না করা হয়ে থাকে।

কেবাং: হেবাং এর মতো কেবাংও একটি রান্নার পদ্ধতি। বাঁশের ভিতরে মাংস ঢুকিয়ে আগুনে ঝলসিয়ে বা কলায় পুড়িয়ে রান্না করা হয়ে থাকে। পাহাড়িরা এতে শুকরের মাংসই বেশি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু অন্য মাংস ব্যবহার করেও এই পদ্ধতিতে রান্না করা যায়। কেবাং পদ্ধতিতে মাছ বা মাংসের সাথে অন্যান্য সকল মশলা মিশিয়ে রান্না করা হয়।

তোজাহ: পাহাড়িরা খুব বেশি শাকসবজি খায়। তোজাহ তাদের একটি পছন্দের সবজি। নানারকম পাহাড়ি সবজি দিয়ে এটি রান্না করা হয়।

পাহাড়ের নানানরকম মুখরোচক খাবারের পাশাপাশি উৎপাদন হয় অনেক ফল। যেমন পাহাড়ি কলা, আনারস, পেঁপে এসব ফলের স্বাদও অন্যরকম। ■

সিনিয়র অফিসার, ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ

গল্প

বিতুনি ও চুকুরি

মাহমুদা আকতার

অনেকদিন আগের কথা। ছোট্ট এইটুকুন একটা পাখি। নাম বিতুনি। তার মা-বাবা নেই। সে একা একা একটা ঝোপের মধ্যে বসে থাকত। কেননা সে উড়তে পারত না। আসলে কখনও উড়ার চেষ্টাই করেনি সে। উড়তে খুব ভয় পেত। সে যেখানে থাকত সেখানে প্রচুর বড়ো বড়ো গাছ। আর গাছগুলোতে থাকত বিশাল বিশাল সব দাঁড়কাক। ওদের ভয়ে বিতুনি কখনও উড়ার চেষ্টা করেনি। উড়া তো দূরের কথা। সে তো ঝোপ থেকে বেরই হতো না। দিনরাত সেখানেই লুকিয়ে থাকত। যাতে কাকগুলো তাকে দেখতে না পায়। একদিন কী হলো লাফাতে লাফাতে একটা কাঠবিড়ালি এল সেই বনে। তার নাম চুকুরি। সে এক দৌড়ে গিয়ে বসল ঝোপের পাশের জারুল গাছটায়। এ সময় বিতুনির দিকে নজর পড়ল তার।

-আরে তুমি এখানে একা একা কী করছ? উড়তে পারো না বুঝি? আচ্ছা আগে তোমার নামটা বলোতো মিষ্টি মেয়ে।

-আমার নাম বিতুনি। ওই যে বিশাল বিশাল কাকগুলো দেখছ ওরা সবসময় আমাকে খ্যাপায়, মজা নেয়। তাই আমি এখানে লুকিয়ে থাকি সবসময়।

-হুম বুঝলাম। তোমার কি এই বড়ো জারুল গাছটায় এসে বসতে ইচ্ছা করে না!

-হ্যাঁ, খুব করে। কিন্তু আমি যে উড়তে পারি না। তবে কী করে যাব ওখানটায়!

-আচ্ছা তাহলে তুমি আমার পিঠে বসো। আমি তোমাকে এক দৌড়ে এখানে এনে দিচ্ছি।

কাঠবিড়ালির কথামতো বিতুনি উঠে বসল ওর পিঠে। একছুটে চুকুরি ওকে জাম্বুল গাছটার মগডালে এনে বসিয়ে দিলো। এরপর সারাটা দিন সেখানে বসে রইল বিতুনি। সে জীবনে প্রথম নীল আকাশটা পুরোপুরি দেখতে পেলো। দেখল বেগুনি বেগুনি জারুল আর সাদা-সবুজ থোকা থোকা ছাতিম ফুলগুলো। আরো দেখলো কত না রঙবেরঙের পাখি আর প্রজাপতি। আসলে সে জীবনে প্রথম ঝোপের বাইরে এসে পৃথিবীটাকে মুগ্ধ নয়নে দেখল। আর চঞ্চল কাঠবিড়ালি এ ডালে ও ডালে ছুটোছুটি করল।

এরপর কোত্থেকে যেন কয়েকটা কাঠবাদাম খুঁজে আনলো চুকুনি। বিতুনিকেও তার থেকে কয়েকটা দিলো। বিতুনি এর আগে কাঠবাদাম খায়নি। সে খায় গাছের কচিপাতা আর পোকামাকড়। তবে কাঠবাদাম তার খুব একটা ভালো লাগেনি। আবার খারাপও লাগেনি। এভাবে অন্যরকম একটা দিন কাটালো বিতুনি। সন্ধ্যার দিকে ওকে আবার পিঠে করে ঝোপে পৌঁছে দিলো চুকুরি। পরদিন সকালে ফের তাকে ছাতিমের মগডালে রেখে গেল। আর নিজে ওপর-নিচ মিলিয়ে ছুটাছুটি করে চলল সারাদিন ধরে। এভাবে দিনগুলো ভালোই কাটছিল বিতুনির। তাই সে চুকুরিকে একদিন বলে, চুকুরি, তুমি তো এখানে ভালোই আছো। তাহলে একেবারে থেকে যাও না এখানে। আমরা দুই বন্ধু একসঙ্গে হেসে খেলে কাটিয়ে দেই।

-হুম কথাটা তুমি খারাপ বলোনি। জীবনে প্রথম তোমার মতো একটা মিষ্টি বন্ধু পেয়েছি। আমি আর কোথাও যাব না। তোমার সঙ্গে এখানেই থাকব।

চুকুরির কথা শুনে খুশিতে ডানা ঝাপটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে ভুল করে না বিতুনি। দিনে বিতুনি গাছের মগডালে বসে থাকে। আর চুকুরি সমানে এ ডাল থেকে ও ডালে ঘুরে বেড়ায়। আর বিতুনিকে দেখে কিচকিচ করে ভালোবাসা জানায়। আর বিতুনি গাছে বসে চুকুরির লাফালাফি দেখে। কখনও একটু বেশি সময় ওকে দেখতে না পেলে সে শিষ দেয়। আর শিষ শুনে পড়িমরি করে ছুটে আসে চুকুরি।

-ও দোস্ত, তুমি আমায় ডাকছিলে কেন বলো তো?
-এমনি। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাইনি তো তাই!

-আর আমি ভাবছিলাম কোনো বিপদ হলো নাকি তোমার।

-কী যে বলো! তোমার মতো বন্ধু থাকতে আমার আবার কীসের বিপদ।

একদিন কী হলো একটা কাক দেখে ফেলল বিতুনি মগডালে বসে আছে। আর অমনি ওকে খ্যাপাতে শুরু করল

-আরে এটা কে রে, আমাদের বিতুনি না! তুই এত উঁচুতে কীভাবে উঠলি রে? তুই তো উড়তে জানিস না। ভয় পাস। তাহলে এখানে এলি কী করে! বাতাস তোকে উড়িয়ে এখানে নিয়ে এসেছে নাকি! ভীতুর ডিম একটা, পাখি জাতটার মানসম্মান ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিস তুই।

এই বলে সে অন্য কাকাগুলোকে ডেকে আনলো। তখন সবাই মিলে বিতুনিকে নিয়ে এমন মজা করতে লাগল যে পাখিটার চোখে জল এসে গেল। তখন রাগের মাথায় সে পাখনা নাড়াতে শুরু করলো। আর কী আশ্চর্য সে উড়তেও শুরু করল। এতে সবচেয়ে বেশি অবাক হলো বিতুনি নিজেই।

-আরে আমি তো উড়তে পারছি! আমি উড়তে পারছি। আমার তো ভয় হচ্ছে না। আমি তো এখন থেকে চাইলেই উড়তে পারব।

সে একবার নিচু দিয়ে উড়ল। আবার শাঁ করে উঁচুতে উঠে গেল। কখনও বা আড়াআড়িভাবে উড়ল। এভাবে সে উড়তেই থাকল। আর উড়তে পেরে সবচেয়ে খুশি হলো বিতুনি নিজেই। তারপর সে বনে সবচেয়ে উঁচু গাছটার মাথায় গিয়ে বসল। তখন তার গর্বে বুকটা ভরে উঠল। এরপর থেকে বিতুনির ওড়ার ভয় কেটে গেল। আর দুষ্টু কাকগুলোকেও সে আর ভয় পেতো না। রোজ সকালে বিতুনি উড়ে উড়ে বনের সবচেয়ে উঁচু গাছটায় গিয়ে বসত। এরপর ওকে দেখতে আসত চুকুরি। তারপর দুজনে মিলে কত গল্প। বিতুনি এখান থেকে ওখানে ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ে বেড়ায়। আর চুকুরিও এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়ে বেড়ায়। এভাবে দুই বন্ধুর দিনগুলো কেটে যাচ্ছে আনন্দে। তোমরা যদি কখনও ওই বনটায় যাও তাহলে দেখতে পাবে বিতুনি আর চুকুনির কত মজা করছে ■

সাংবাদিক ও অনুবাদক

গল্প

খুঁজে ফেরা

আনিস রহমান

ইউসুফের মন এখন বেশ পলকা। উড়ু উড়ু। একটু কষ্ট, একটু ভালো লাগা, বার বার কাছে আসছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে ওকে বাহারি প্রজাপতির মতো। ওর বুকের গভীরে নরম ঘাসের মতো কিংবা বেড়ালছানার তুলতুলে গা নিয়ে গুটিসুটি মেরে আছে ভালো লাগাগুলো। এমন ন্যাওটে ওরা একটুও তাড়ানো যায় না। এড়ানো যায় না কিংবা দূরে ঠেলে দেওয়াও যায় না। ওর বুকের গভীরে মিশে আছে ওরা লজ্জাবতী লতার মতো।

পঞ্চাশ বছর পর দাদুকে খুঁজে পেয়েছে। আশ্চর্য! দেশের স্বাধীনতার যখন পঞ্চাশ বছর, দাদুও ফিরে এসেছে তখন স্বাধীনতার হাত ধরে। এক নয়, দু-নয়। পাঁচ কিংবা সাত নয়। পাঁচ দু-গুণে দশ। তাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে হয় পঞ্চাশ। ঠিক ওই সময়টাতেই মানে পঞ্চাশ বছর আগে দাদু হারিয়ে গিয়েছিল ডাব বাগানে একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। এঁদো ডোবা ঝোপঝাড়ে ভরা ছিল চারদিক, এখনও আছে। মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ি, এক চিলতে উঠোন উঁকিঝুঁকি দিলেও বনবাদাড়ে ঢেকে আছে চারপাশ। এমনি ঝোপঝাড়ের ভিড়েই হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন দাদু। সেখানেই আজ দাদুর দেখা পেল ইউসুফ। এ বন, ঝোপঝাড় ছাপিয়ে এক চিলতে আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে অনেক দূরে। বিরান পথ। মাঝেমধ্যে দু-একটা ভ্যানগাড়ির দেখা মেলে। ক্রিংক্রিং শব্দ তুলে মত্ত হয়ে ছুটে যায় ওরা। আর কোনো বাহন দেখা যায় না এ পথে। আর কোনো শব্দও কানে আসে না। কেবল টিউ টিউ করে নাম না জানা কী এক পাখি ডেকে ওঠে বার বার।

এ-গাছে ও-গাছে, গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। মাঝে মাঝে দু-একটা অস্থির পাখি পাখা ঝাঁপটে পথের এপার-ওপার করছে। কখনও আবার ঝোপের ভেতর মিলিয়ে যাচ্ছে।

ফাঁকা রাস্তায় এলোমেলো হাঁটছে ইউসুফ। এদিক-ওদিক চোখ যাচ্ছে। কী যেন খুঁজছে সে চোখ। কিন্তু চোখে ধরা দেয় না। এবার ও মগ্ন হয়ে কান পাতে। ব্যাকুলতা নিয়ে দৃষ্টি ছড়ায়। দাদুকে ও খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু ধরা দিচ্ছে না। কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ছায়া হয়ে পিছু পিছু আসে, চোখ ফেরালে ফুড়ুৎ করে হারিয়ে যায়। ভীষণ দুষ্টু দাদু! কোথায় কাছে কাছে থাকবে, কত খুঁজে পেতে তবে পেয়েছি দাদুকে, অথচ ও শুধু ছায়া হয়ে যায় চোখ ফেরালেই। তুমি না হয় ছায়া হয়েই থাকো, বুঝেছি লুকোচুরি খেলা তুমি খুব ভালোবাসো। আমি বরং আশপাশ একটু ঘুরেফিরে দেখি। কী সুন্দর জায়গা! চোখ জুড়িয়ে যায়। মন ভরে যায়। সে জন্যেই বুঝি দাদু যুদ্ধ শেষ হলেও ফন্দি করে এখানে রয়ে গেছে

কাউকে কিছু না বলে-কয়ে। পথ চলে ইউসুফ। আঁকাবাঁকা পথ ধরে একটু একটু করে অনেক দূর হেঁটে যায়। হারিয়ে যাবার ভয় নেই ওর। বাবা-মা খুঁজবে ওকে। তখন না পেলে ওরা রাগ করবে কিনা সে ভয়ও নেই ইউসুফের। ও বিড়বিড় করে শুধু বলে, আমি একা কে বলল! এখানে দাদু আছে আমার সঙ্গে, তখন আবার ভয় কীসের।

ও চারদিক দেখে। মুগ্ধতা খেলা করে ওর চোখে-মুখে। প্রজাপতি দেখে মুগ্ধ হয়। বলে, বাহ্ এত সুন্দর প্রজাপতি হয়! ওদের বাসার বারান্দায়, জানালার কার্নিশে শুধু কালো কালো প্রজাপতির দেখা পেতো ইউসুফ। সেভাবে চোখ কাড়ে না। বাহারি রং ছড়ায় না। একঘেয়ে রং শুধু। কী অদ্ভুত! ওরা কখনও ঘরের বারান্দার মেঝেতেও বসে থাকে। আশপাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও নড়ে না। উড়ে যায় না। কেমন অলস অলস ভাব। অথচ এখানকার প্রজাপতির রং কী মিষ্টি! কত কত রং ওদের গায়ে বোনা! কোনোটায় লাল-হলুদের মিশেল। কোনোটা আবার হলুদ-কালোর আঁকিবুঁকি। চঞ্চলও ভীষণ। বড্ড দুষ্টু ওরা। কেবল ওড়াওড়ি। এ...ই গাছের পাতায়, অমনি শন বনে। অস্থিরতা নেই একদম। ওদের কাণ্ড দেখে ভীষণ আনন্দ হয় ইউসুফের। ওর চোখেও দুষ্টুমিরা আলো ছড়ায়। হঠাৎ মনে হয় দাদুকে দিব্যি ভুলে আছে ও। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। রাগ করে অন্য কোথাও চলে যায়নি তো দাদু! ও দু-চোখ বুজে ডাকে, দাদু এবার চলে এসো আড়াল থেকে। চলে এসো আমার সামনে। আমি চোখ খুললেই যেন তোমাকে দেখতে পাই। তা না হলে ভীষণ কষ্ট পাব দাদু!। আমার এখনই কান্না পাচ্ছে কিন্তু! কথা শেষ করে পিটপিট করে তাকায় ইউসুফ। নাহ্, দাদুকে দেখা যাচ্ছে না।

এবার দু-হাতের পাতায় চোখ ঢাকে ইউসুফ। আমি হাত সরাতেই তোমাকে যেন দেখতে পাই দাদু! খানিক অপেক্ষা। এবার হাত সরায় ইউসুফ। চোখ খোলে। তাকায়, সামনে-পিছনে চারদিকে। কিন্তু কাউকে তো দেখছে না কোথাও। ইউসুফ মন খারাপ করে। অমনি টিউ টিউ করে একটা পাখি ডেকে উঠতেই পেছন ফিরে তাকায় ও। উড়ে এসে পাখিটি গাছের ডালে বসে। কী পাখি! নাম কী ওর! দেখতে কেমন! এমনি ভাবনা নিয়ে পাখিকে যখন খুঁজছে ইউসুফ তখন ওর চোখ খেয়াল করে, গাছের আড়াল থেকে কে যেন উঁকিবুঁকি দিচ্ছে। ইউসুফ হেসে ওঠে। দাদুটা একদম বোকা, গাছের গুঁড়িতে শরীর ঢেকে রাখলে কী হবে, দাদুর ছায়াটা তো ঠিকই দেখতে পাচ্ছে ও। পড়ন্ত বিকেলের লম্বাটে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দাদু। অনেক দূর ছড়িয়ে আছে। গাছের সাধ্য নেই সে ছায়া ঢেকে রাখে। ইউসুফের মন ভালো হয়ে যায় মুহূর্তে। বলে, অনেকদিন পর দেখা তো! তাই দাদু কেমন যেন লজ্জা পায় কাছে আসতে। আমাদের সঙ্গে মিশতে, কাছে আসতে

তোমার এত বাধো বাধো ঠেকে কেন দাদু! একরাশ বিরক্তি ওর চোখেমুখে! দাদু ছায়া হয়েই থাকুক! বলে পথ এগোয় ইউসুফ। আড়চোখে তাকায় ও। দাদুর ছায়া এ-গাছ থেকে ও-গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াচ্ছে। পিছু পিছু আসছে ইউসুফের। কিছু বলে না ও। মিটিমিটি হাসে। পথ এগোয় গুটিগুটি। ভাবে, এত্ত এত্ত স...ব, সবই তো দাদুর জায়গা। এমনি আলপথে, মেঠো পথে সবসময় হাঁটেন দাদু। তার পা পড়েনি এমন জায়গা এখানটায় খুঁজে পাওয়া ভার। পঞ্চাশ বছর! কম তো নয়! তখন থেকেই এখানটায় দাদুর বসবাস।

দাদু পাশে পাশে আসুক বা না আসুক, ওর পিছু পিছু আসুক বা না আসুক, ভাবনা নেই ইউসুফের। এ গাছের পাতা, পথের ধুলো, কাশফুল-ঘাসফুল সবকিছুতেই দাদুর ছোঁয়া রয়েছে। দাদুর ছায়া পড়েছে। তাহলে দাদু আর দূরে কোথায়! ঝোপঝাড় গাছের পাতার বুনোন, সবটাতেই দাদু মিশে আছে, মিশে থাকে সবসময়। হাত বাড়ালেই দাদুর ছোঁয়া পায় ইউসুফ। তখন দাদুকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে না পারলেও, তার হাত ধরে হেঁটে হেঁটে বিকেল না দেখলেও ও ঠিকই জানে দাদু আছে পিছু পিছু। ঠিকই চোখ রাখছে ওর দিকে। কেবল দাদুর লজ্জাটা কোনোভাবেই যেন ভাঙছে না। তাই ওর কাছাকাছি আসতেই দাদুর যেন রাজ্যের অস্বস্তি। এমনকি বাবার কাছ থেকেও দূরে দূরে থাকছে দাদু। অথচ দাদু বাবাকে না বলে-কয়ে যুদ্ধে চলে যাওয়ায় বাবা সেদিন কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল। উঠোনে পড়ে হাপুস করে

কেঁদেছে বাবা। বাবার তখন বয়স আর কত! সাত ছুঁই ছুঁই। দস্যিপনা বয়েস। কোথায় যেন খেলতে গিয়েছিলেন, কোন দূরে, মাঠে না ঝোপঝাড়ে, কে জানে! অনেক সময় ধরে পই পই করে বাবাকে খুঁজেছে দাদু। কোথাও পায়নি। অগত্যা গোছগাছ করে পথে বেরিয়ে আসে। দিদাকে লক্ষ্য করে দাদু বলে, পাগলটা যে কোথায় গেল। অনেক খুঁজেও ওর টিকিটিরও দেখা পেলাম না। ও বাড়ি এলে বলো, আমি খুব রাগ করেছি। তখন বড্ড তাড়া ছিল দাদুর। দেশে যুদ্ধ বেঁধেছে। এখনই রওনা হতে হবে। তাই আর দেরি না করে ঘুরপথ ছেঁটেছুটে আলপথ ধরেছে।

বিকেল বিকেল বাবা ফিরে আসে ঘরে। তখন রোদ অনেকটা নরম হয়েছে। বাসন্তি রোদের ছোঁয়া চারদিকে। তাই রোদেভেজা ক্লান্তি নেই তার গায়ে। বরং চনমনে এক আনন্দ তার মনের ভেতর নেচে বেড়াচ্ছে। থেমে নেই। লাফাতে লাফাতে একবার উঠোনের এপাশে তো আরেকবার ওপাশে যাচ্ছে। এসেই দাদুকে খুঁজছিল। অনেক কথা জমে আছে, বলা হয়নি দাদুকে। সারাদিনের সব জমানো গল্প দাদুকে পেলেই ঢেলে দেয়। ভাণ্ড খালি না হওয়া পর্যন্ত কথার ফুলঝুরি ছোটে বাবার মুখ থেকে। দাদুও কখনও থামিয়ে দেয় না বাবাকে, কিংবা বারণ করে না। পুরো মন ঢেলে ছেলের কথা শোনে দাদু। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো প্রশ্ন। নানা কৌতূহল প্রকাশের চেষ্টা। তখন আরও উৎসাহ নিয়ে বাবাকে গল্প শোনায় দাদু। আজ সে ছেলে যখন গল্পে গল্পে ভাণ্ড ভরে এসেছে বাবাকে শোনাবে বলে, তখন এসে দেখে বাবা নেই! চলে গেছে দূরে। যুদ্ধে যাবে বলে।

সেই যে গেছে এরপর পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে সে ছেলে আজ তার বাবাকে খুঁজে পেয়েছে। দাদুকে সে গল্প আর বলা হয়নি সেদিন। বলা হয়নি তা আর কোনোদিন। কথাগুলো আজও ভোলেনি বাবা। ইউসুফের সঙ্গে গল্পে গল্পে মেলাদিন সেসব কথা বলেছেন বাবা।

ডুমুরকান্দি বিলের পাড় ঘেঁষে হাঁটছিল বাবা। সঙ্গে পাড়ার অন্য বন্ধুরা। বিলের জল টলটলে। মুখ দেখা যায় জলের আয়নায়। জায়গাটি রোদ আর ছায়ায়

মায়াময় হয়েছিল। হঠাৎ দেখে ইয়া বড়ো এক শোল মাছ। লেজ নাড়ছে আর বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে আছে ওপরে। কেমন রাগি-রাগি চেহারা। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। লালচে রঙের অগুণতি পোনারা মাকে ঘিরে কিলবিল কিলবিল করছে। পোনারা একবার মায়ের পিঠের ওপর আবার জলের ওপর লাফিয়ে পড়ছে। ওরা বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছে। ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল ওদের। মা আর পোনাদের দেখে দেখে এক সময় কেন যেন বাড়ির কথা বড্ড মনে হলো বাবার। একছুটে বাড়ি চলে এল। এসেই বাবা বাবা বলে ডেকে উঠতেই দেখে মা ওর মুখে আঁচল চেপে কাঁদছে। মুখের রা মুখেই থেমে যায় ওর। অবাক, বিস্ময়, বোকাটে ভয় মেশানো এক মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে।

তখনই জেনেছিল অনেক খোঁজাখুঁজি করে ওকে না পেয়ে শেষে বাবা মন খারাপ করে চলে গেছেন যুদ্ধে। ইপিআর মানে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ চাকরি বাবার। আধা মিলিটারি বাহিনী। দাদুকে দেখতে না পেয়ে বাবার সব আনন্দ যেন মুহূর্তে জল হয়ে গেল।

সেই থেকে বোকা বোকা চোখে শুধু মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, বাবা। সেই থেকে অপেক্ষা দাদুর জন্যে, এই বুঝি দাদু এল। যুদ্ধ শেষে অনেকে ফিরে এলেও দাদু এল না। নিখোঁজ দাদু। অনেক খুঁজেছে। এদিক ওদিক কত খোঁজ লাগিয়েছে দিদা। কিন্তু দাদুর কোনো খোঁজ মেলেনি। অথচ আজ পঞ্চাশ বছর পর সেই হারানো দাদুর দেখা পেল ইউসুফ, ওর বাবা-মা এবং আরও অনেকে।

ইউসুফ ওর বাবাকে বলে, সেদিন তোমাকে দাদু অনেক খুঁজেও না পেয়ে চলে গিয়েছিল যুদ্ধে। সে জন্যেই তো দাদু রাগ করে আর বাড়ি ফেরেনি। বাবা শোনে ইউসুফকে। তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে না।

ইউসুফ ভাবে, আমার এ বয়সে বাবা হারিয়ে গেলে আমার কেমন কষ্ট হবে!

ওর বাবা তো তখন ছিল আরও ছোটো। তখন বাবার কষ্ট ছিল আরও অনেক অনেক বেশি।

ও মাকে বলে, মা, আমাকে বাবার জায়গায় রেখে আমি বুঝতে পেরেছি বাবার কষ্ট কতখানি।

বাবা কাঁদে না। মুখ ফুটে কিছু বলে না। তবে মাঝে মাঝে একা একা কী যেন ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে। তখন কেন যেন মনে হয়, বাবা দাদুকে ভাবছেন!

আজ সে দাদুকে খুঁজে পেয়েছে বলে আনন্দের শেষ নেই। তার চেয়ে বেশি আনন্দ ওর, বাবার মনে এখন আর কষ্ট থাকবে না। কষ্ট নিয়ে মাঝে মাঝে দাদু আর একা হয়ে যাবে না। বাবা একা একা বিড়বিড় করে কিছু বলবে না। এমনি ভাবনার হাত ধরে একা একা অনেকটা পথ চলে আসে ইউসুফ। সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে। এবার ফেরার পালা। তা না হলে বাবা ভীষণ দুশ্চিন্তা করবেন। পড়ন্ত সূর্যের আলো সুপারি গাছে, বাঁশঝাড়ে মায়া ছড়াচ্ছে।

লোকটাকে এখানে, ওর পাশে আবার দেখে চমকে ওঠে ইউসুফ!

রাস্তার ওপারে, অনেকটা গভীরে বুনো ঝোপঝাড়ের পাশেই একটা পুকুর। পানা জমেছে। শ্যাওলা ভাসছে থকথকে কাদার মতো। জলের রং সবুজাভ। ওখানটায় ঘুরে ঘুরে যখন দেখছিল ওরা, কোথায় কোথায় যুদ্ধ হয়েছে। কোন ডোবায়, কোন ঝোপের আড়ালে কিংবা কোন উঠোনে। মুরগির খোঁয়াড়ের ধারে গুলি খেয়ে মানুষ মরে পড়েছিল যুদ্ধে, তখনই কারা যেন লোকটাকে সামনে নিয়ে আসে বাবার। কেউ একজন ওর পাঞ্জাবি তুলে ধরে। কেউ ওর লুঙ্গির গিঁট ঢিল করে তলপেট অবধি নামিয়ে দেয়। তখনই ঝুপ করে বেরিয়ে আসে একদলা মাংসের পিণ্ড। তখন আপনার বাবা আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সাফ করছিল। সুরুজ কবরেজ তখন ওদের জন্য ভাত-তরকারি রান্না করে নিয়ে এসেছে অনেক দূর থেকে। থালাবাটি ধুয়ে ওদের খাবারের আয়োজন করছিল সুরুজ। তখনই পাক আর্মিদের একটা জিপ এসে থামে সরু ওই রাস্তার ধারে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়ির আড়ালে শুয়ে এলোপাথারি গুলি ছুড়তে থাকে পাকসেনারা। সে গুলির একটা ওর পেটের বাঁ পাশ ঘেঁষে চলে যায়। তাতেই এ হাল সুরুজ কবরেজের।

আর খানিকটা ভেতর দিয়ে গেলেই গুলিটা জীবন কেড়ে নিত নিশ্চিত। জীবন ওর কেড়ে নেয়নি সত্য, তবে যেভাবে ভেদ করে গেছে তাতে নাড়িভুঁড়ি অনেকটাই বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন সঙ্গে সঙ্গে কয়েকপ্রস্ত গামছা দিয়ে বেঁধে ওকে নিয়ে যাওয়া হয় পাবনার এক ছোট্ট হাসপাতালে। সে যাত্রায় বেঁচে গেলেও মাংশপিণ্ডের ভার আজও বয়ে বেড়াতে হয় সুরুজ কবরেজকে। সেই এবড়ো-খেবড়ো মাংশপিণ্ড দেখে দারুণ-রকম চমকে গিয়েছিল ইউসুফ। বলা যায়, বড্ড ভয় পেয়েছিল ও। শরীরে কেমন যেন ঝাঁকি খেয়েছিলো জোরসে। সেই মানুষটাই এখন ওর সামনে। মুখ ভরা পান। ঠোঁটের দু-পাশের কষ বেয়ে রস গড়াচ্ছে। রাঙা রসে ঠোঁট রঙিন দেখাচ্ছিল সুরুজ কবরেজের।

দূরে একটিলতে দেয়াল। দু-ইট সমান উঁচু। সুরুজ দেয়াল দেখিয়ে বলল, অইহানেও মুক্তি শুয়ে আছে। একজনও হইতে পারে, তিনজনও হইতে পারে। যত দেয়াল দেখবা সবই মুক্তিযোদ্ধাদের কবর। অনেকে এ গ্রামেরই মানুষ ছিল। মুক্তিগো লগে থাকত। ওগো মোট বইতো। অস্ত্র-গোলাবারুদ কান্দে নিয়া নানা জায়গায় পৌছাইয়া দিত। দেশের জন্য কত যে কষ্ট করছে মানুষগুলা চোক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবা না। অগো লগে লগে আমি ছিলাম। আমি জানি ওদের কষ্টের কথা। কতদিন না খাইয়া থাকছে। বড়োজোর একমুঠো মুড়ি আর এক গেলাস পানি। পানির কলের কাছে গেলেও ছিল বিপদ। যেমন আমার কথাই ধরো। পায়ে পায়ে তখন বিপদ আর বিপদ!

ইউসুফ একমনে সুরুজ কবরেজের কথাগুলো শোনে। এক সময় আবার সাহস করে বলে, আপনার পেটটুকু আবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

লোকটি হাসতে হাসতে ফের পাঞ্জাবি তোলে। ঝুপ করে একদলা মাংশপিণ্ড বেরিয়ে আসে। ফের চমকে ওঠে ইউসুফ। চোখ বন্ধ হয়ে আসে। এক পা পেছনে সরে যায়। চোখে-মুখে ওর দারুণ বিস্ময়।

অল্পের জন্য তোমার দাদু রক্ষা পেয়েছিল সেদিন। সে যাত্রা বেঁচে গিয়ে জায়গা বদল করল ওরা। রাস্তা পেরিয়ে অনেক গভীর জঙ্গলে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ল। সে খবর পেয়ে যায় পাকসেনারা। গ্রামে গ্রামে পাকসেনাদের অনেক দালাল ছিল তখন। ওরাই পাকসেনাদের খবর দিয়ে আসে চুপি-চুপি। এর আগে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেদম মার খেয়েছিল ওরা। একসময় লড়াইয়ে খ্যান্ত দিয়ে পিছু হটে যায়। সে প্রতিশোধ নিতেই এবার অনেক গোলাবারুদ আর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা। রহস্যময়ভাবে হঠাৎ কেমন যেন চুপ হয়ে যায় লোকটি। মুখ অন্ধকারে ঢেকে যায়। মুখের রা থেমে যায়। দূরে পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে অপলকে। এক সময় হুঁশ ফেরে সুরুজের। বলে, চলো দাদু তোমারে বড়ো রাস্তার ধারে দিয়া আসি। ওদিকে তোমার বাবা অপেক্ষা করছে।

ইউসুফ মুখে কিছু বলে না। চারদিকে একবার চোখ ফেরায় শুধু। কী যেন খোঁজে। সুরুজ বুঝতে পারে। বলে, তোমার দাদুর বড্ড লজ্জা। তাই সামনে আসে না। চলো, আমরা পা বাড়াই। দাদু ঠিকই আসবে। আমাদের পিছনেই আছেন উনি। তোমার দাদুর পুরো দলটাকে আমিই ভাত খাওয়াইতাম। কত দূর দূর জায়গা থেকে ভাত জোগাড় করেছি। তোমার দাদুর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। ছিল মানে...! ইউসুফের প্রশ্নে একটু ভড়কে যায় সুরুজ। ছিল মানে এখনও আছে! খুব ভালো মানুষ তোমার দাদু!

কথায় কথায় বড়ো রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ায় ইউসুফ। বেশ খানিকটা দূরে বাবা দাঁড়িয়ে। পাশে মাইক্রোবাস। কয়েকটা ভ্যানগাড়ি আর রিকশা। মেলা মানুষের ভিড়। পেছনেই খোলা চত্বরে সুন্দর একটি স্মারক স্তম্ভ। অপূর্ব তার নকশা। কী যেন না বলা কথা লুকিয়ে আছে সে নকশার মধ্যে। অনেক মানুষ জড়ো হয় স্মারক স্তম্ভ ঘিরে। বাবা ইউসুফের হাতে মোবাইল দিয়ে বলে, ইউসুফ তুমি এদিকেই থাকো, আমাদের ছবি তুলবে।

ছবি তুলতে ভীষণ আনন্দ ইউসুফের। ও মোবাইল তাক করে নানাভাবে ছবি নিতে থাকে টুকুস টুকুস করে। শেষ বেলার রাঙা আলোয় ভিজে যাচ্ছে নাম ফলকটি। ফলকটি শ্বেত পাথরে গড়া। কতগুলো নামের সারি। তার মাঝ বরাবর আসতেই একটি নাম মোহাম্মদ ইলিয়াস। নামটির দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে বাবা।

এক সময় অক্ষরগুলো মুছে গিয়ে সেখানে বাবার মুখ ভেসে ওঠে। কতদিন পর বাবার মুখ দেখল। চোখে জল জমে আসে। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে বাবার। সবার কাছ থেকে আড়াল করে চোখের জল মুছে নেয় বাবা। ব্যাপারটি ইউসুফের চোখ এড়ায় না।

কে যেন বলে, এটাই ডাববাগান। এ পুরো তল্লাটে অনেক ডাবগাছ ছিল। তাই লোকে বলে ডাববাগানের যুদ্ধ। এখন ডাবগাছ নেই বললেই চলে। জায়গাটির নাম এখন শহিদনগর। যুদ্ধে শহিদদের সম্মানেই এ নাম রাখা হয়েছে। লোকটি কথায় কথায় ওর লেখা ছোটো একটা পুস্তিকা ধরিয়ে দিল ইউসুফের বাবাকে। বলল এর মধ্যে সব লেখা আছে। আমার ঠিকানাও আছে।

ওদের গাড়ি রাস্তা কেটে ছুটে চলে। গাছপালা ফুঁড়ে ছুটে চলেছে ওদের গাড়ি। অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। কেউ কথা বলে না। শুধু চাকার একঘেঁয়ে শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

এক সময় ইউসুফের মুখে রা ফোটে, দাদু তো আমাকে দেখাই দিল না। শুধু পালিয়ে পালিয়ে রইল!

আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে সোনা। তোমার দাদু বলেছে ইউসুফকে দেখে রাখিস। ও অনেক ভালো ছাত্র। অনেক বড়ো হবে। যখন ওর মন চায় নিয়ে আসবি ওকে আমার কাছে।

তাই বলেছে বুঝি!

বাবা মাথা নাড়ায়।

আজ তাহলে আমাদের সঙ্গে এল না কেন?

এখানে এত দিনের বসবাস, অনেকদিনের ঘরবাড়ি। বললেই কী সেসব ছেড়ে হুট করে চলে আসা যায়!

পরে আসবে তো?

তাই তো বলল। একটু গুছিয়ে নিতে সময় চাইল।

তখন আমার সঙ্গে দেখা না করলে ভীষণ রাগ করবো কিন্তু। কথাও বলবো না।

বাবা শুধু মাথা নাড়ায়। হঠাৎ উলটো দিকের গাড়ির হেড লাইটের আলো এসে পড়ে ওদের মুখে। তখন ইউসুফ খেয়াল করে বাবার চোখে জল। গাল বেয়ে নামছে। ইউসুফ অবাক হয়। তুমি কাঁদছ? কাঁদছ কেন বাবা?

খুশিতে!

দাদুর সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে?

ফের মাথা নাড়ায় বাবা। দুচোখে ওর জলের ধারা। অঝোরে নামছে। বুক ভেসে যাচ্ছে বাবার। ■

কথাসাহিত্যিক ও পরিচালক, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

টুনটুনিদের বাসা

মো. কামাল শেখ

ডালিম গাছে টুনটুনিদের ভাঙল বাসা কে,
তাই নিয়ে আজ লাউয়ের মাচায় সভা বসেছে।
আসলো প্যাঁচা, আসলো শালিক, খঞ্জনা আর বাজ,
বুলবুলিরা বলল ছি ছি কী ভয়ানক কাজ।
শকুন সে তো রেগেই আগুন উত্তেজনায় খান,
ঠোকর দিয়ে আজকে নেবে সেই পাজিটার জান।
নেই বেজি আর শিয়াল কোনো এই পাড়াতে সাপ,
জিভ কেটে ব্যাঙ বলল না ভাই এসব মহাপাপ।
চিল তো গেছে চিতলমারী কাক কলসির হাটে,
কাহার দ্বারা এমন ক্ষতি হয় এ তল্লাটে।
চড়ুই গিয়ে দেখছে খুঁজে গাছের শাখাটায়,
হয় তো যদি পাতার ভাঁজে প্রমাণ কিছু পায়।

টিয়া পাখি ভীষণ কেঁদে ঠোঁট ভিজিয়ে লাল,
বলছে ধরা পড়তে হবে আজ অথবা কাল।
বেচারিদের ছোট্ট বাসা ভাঙল কীসে হায়,
সব পাখিরা এক হয়ে তার হদিস খুঁজে যায়।
বাসার শোকে টুনটুনিরা লাউয়ের মাচায় ফিট,
শান্ত্বনা দেয় গা বুলিয়ে পতঙ্গ আর কীট।
হঠাৎ করে মাচার নিচে কী জানি উদ্ভট,
গর্জে ওঠে শব্দ করে খটরমটর খট।
মানুষ দেখে সব পাখিরা লুকায় ডালে দূর,
খটরমটর যন্ত্রটা তার শব্দে ভেঙে চুর।
কাটছে লতা, কাটছে পাতা কাটছে কত কী,
কিন্তু এখন টুনটুনিদের বাসার হবে কী !

সায়মা আদিবা আভা, ৩য় শ্রেণি, আইডিয়াল প্রিপারেটরি অ্যান্ড হাই স্কুল, শেরপুর

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ

করোনা মহামারির সময় পেরিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জনজীবন। ২০২০ সালের শুরু থেকে হওয়া করোনা মহামারির কারণে মানুষের মধ্যে পুষ্টি পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। খাদ্য বৈষম্যের কারণে কম ওজনের শিশু জন্ম নেওয়া, শিশুরা বেঁচে থাকলেও খর্বকায় হওয়া, আবার উচ্চতা ঠিক থাকলেও অপুষ্টির কারণে কম ওজন বিশিষ্ট হয়ে বেড়ে উঠার প্রবণতা বেড়েছে। বিভিন্ন কারণে শিশুদের মধ্যে ভিটামিন-ডি, ক্যালসিয়াম, ফলিক এসিডের ঘাটতিও বেশ স্পষ্ট। পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ২৩শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে পালিত হয়েছে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ। পুষ্টি সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য 'সঠিক পুষ্টিতে সুস্থ জীবন'। পুষ্টি হলো যে প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় খাদ্য শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শক্তি ও তাপ উৎপাদন করে এবং তা বজায় রাখার জন্য কাজও করে।

বাংলাদেশে প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষ স্ট্যান্টিং নিয়ে বেড়ে উঠছে। ইদানীং স্ট্যান্টিং (উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন) কমে গেলেও তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমছে না। দ্রুত পুষ্টির ঘাটতি কমিয়ে স্ট্যান্টিং কমিয়ে আনতে না পারলে এসডিজির লক্ষ্য পূরণ হবে না। বিশেষ করে পূর্ণ বয়স্ক নারীদের মধ্যে কম ওজন পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকার মানুষ এবং হাওর এলাকার মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা কম। শহুরে এলাকার মানুষের মধ্যে পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হলেও নিম্নবিত্তদের ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের অর্ধেকই স্ট্যান্টিং-এ ভুগছে। তাদের ৬ থেকে ২৩ মাস বয়সি প্রতি ৪টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু (২৫.৯ শতাংশ) যথাযথ পুষ্টি পেয়ে বড়ো হতে পারছে না। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সপ্তাহব্যাপী পুষ্টি সপ্তাহে ৭টি বার্তা দেশব্যাপী প্রচার করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

১. জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে শাল দুধ খাওয়ানো

২. শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ এবং ৬ মাস বয়সের পর থেকে ২ বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি সুষম খাবার দেওয়া

৩. শিশু সঠিকভাবে বেড়ে উঠছে কি না জানতে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ করা

৪. কিশোর-কিশোরীদের ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করা

৫. গর্ভবতী ও প্রসূতি মাকে স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দেওয়া এবং নিয়মানুযায়ী আয়রন-ফলিক এসিড ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়ানো

৬. পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের পুষ্টি চাহিদার প্রতি নজর দেওয়া

৭. স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং কোভিড প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করার পরামর্শ

সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজনে আরো ছিল সেমিনার, আলোকসজ্জা, ব্যানার, ফ্যাস্টুন ও গণমাধ্যমে প্রচার। এছাড়া প্রতি জেলা ও উপজেলা, বিভাগে দুস্থদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। ইপিআই টিকা কেন্দ্রে আসা মায়েদের মধ্যে বিশেষ পুষ্টি বার্তা বিতরণ করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় মসজিদে জুম্মার খুতবায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিয়ে বিশেষ বার্তা প্রদান করা হয়েছে।■

প্রতিবেদন : মাহমুদা নিরা

গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের জয়

ইউরোপিয়ান গার্লস ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াডে (ইজিএমও) দুটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। বাংলাদেশ দলের সদস্য নুজহাত আহমেদ ১৭ পয়েন্ট ও রাইয়ান বিনতে মোস্তাফা ১৬ পয়েন্ট পেয়ে ব্রোঞ্জপদক জিতে। ৮ ও ৯ই এপ্রিল এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চার সদস্যের বাংলাদেশ দল ঢাকার একটি কেন্দ্র থেকে ভার্চুয়ালি অংশ নেয় এই প্রতিযোগিতায়। হাঙ্গেরি থেকে আয়োজক কমিটি এই অলিম্পিয়াড পরিচালনা করে।

এবার দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এ বছর দলীয় ভিত্তিতে মোট ৫৭ পয়েন্ট পেয়ে ৫৭টি দেশের মধ্যে ২৯তম হয়েছে বাংলাদেশ দল। গত বছর এই প্রতিযোগিতায় সব মিলিয়ে ২৭ পয়েন্ট পেয়েছিল বাংলাদেশ দল ।

নুজহাত ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আর রাইয়ান হলিক্রস কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। এছাড়া বাংলাদেশ দলের অপর দুই সদস্য সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আরিফা আলম ১১ পয়েন্ট ও হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আফসানা আকতার ১৩ পয়েন্ট পেয়ে সম্মানসূচক স্বীকৃতি পেয়েছে।

উল্লেখ্য, ইউরোপিয়ান গার্লস ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াড মেয়েদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড। ২০১২ সালে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা । বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ ২০ বছর বয়সি ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রতিযোগীদের ছয়টি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে হয়। এ বছর এই অলিম্পিয়াডে ৫৭টি দেশের ২২২ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। প্রতিদিন তিনটি করে গণিত সমস্যা সমাধান করতে হয়েছে অংশগ্রহণকারীদের।

বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির তত্ত্বাবধানে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলো পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের নেতা ছিলেন গণিত অলিম্পিয়াডের একাডেমিক কাউন্সিলের ঈপ্সিতা বহ্নি , উপ দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন গণিত অলিম্পিয়াডের একাডেমিক কাউন্সিলর মুরসালিন হাবিব। আর পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন একাডেমিক কাউন্সিলর নিশাত আনজুম।■

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

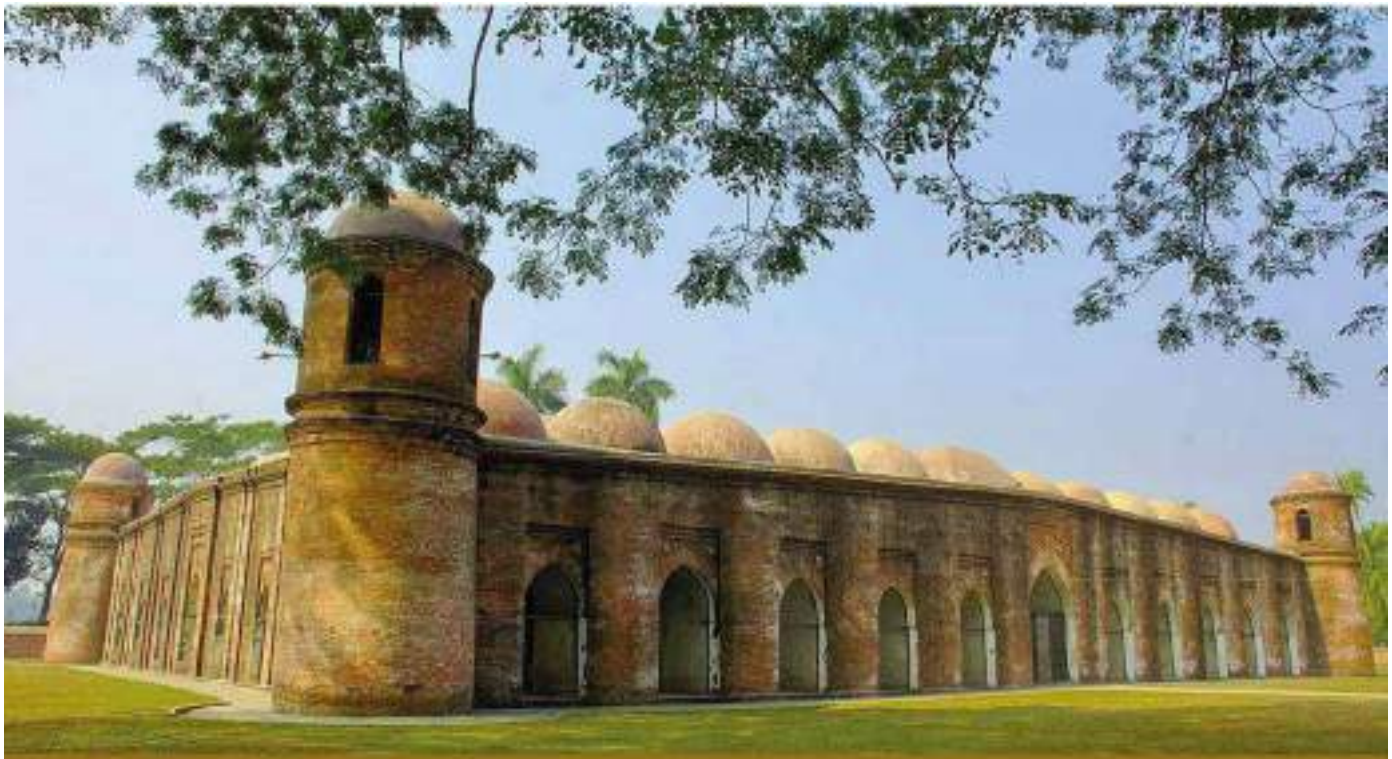

বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় বাগেরহাট

বাগেরহাট বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা বিভাগের অন্তর্গত বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত একটি শহর। এ শহরটি মসজিদের জন্য বিখ্যাত। প্রাচীন স্থাপনার জন্য বিশ্ববিখ্যাত ২৫টি ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদের এই শহর বাগেরহাট। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হুমকির মুখে থাকা সাংস্কৃতিকভাবে উল্লেখযোগ্য এসব স্থানের তালিকা করেছে 'ওয়ার্ল্ড মনুমেন্টস ওয়াচ' (ডব্লিউএমএফ)। বিশ্বজুড়ে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেসব স্থান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ভারসাম্যহীন পর্যটন ও কম প্রচারের কারণে পিছিয়ে পড়ছে; সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে সহায়তা দেওয়া এবং এসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে ডব্লিউএমএফ।

সম্প্রতি ডব্লিউএমএফ ২০২২ সালের এ তালিকা প্রকাশ করেছে। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পর পর তারা এ তালিকা প্রকাশ করে আসছে। এবারের তালিকায় অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ যে ২৫টি ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে, তা ১২ হাজার বছরের ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করছে। ২২৫টিরও বেশি স্থানের মনোনয়ন থেকে যাচাই-বাছাই করে ২৫টি স্থানকে ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে 'ওয়ার্ল্ড মনুমেন্টস ওয়াচ'। মসজিদের শহর বাগেরহাট এ তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশের একমাত্র স্থান।

তাদের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, পনেরোশ শতকে মুসলিম ধর্মপ্রচারক খান জাহান আলীর হাত ধরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভৈরব নদীর তীরে বাগেরহাট শহরের গোড়াপত্তন। শহরটির ঐতিহ্যবাহী ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ষাট গম্বুজ মসজিদ, সিংরা মসজিদ, খান জাহান আলীর সমাধিসৌধ, নয় গম্বুজ মসজিদ, জিন্দাপীর মসজিদ, বিবি বেগনী মসজিদ, চুনাখোলা মসজিদ, রনবিজয়পুর মসজিদ। দিল্লির তুঘলকি স্থাপত্য রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপনায় সমৃদ্ধ এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল খলিফাতাবাদ ।

এ বছরের তালিকায় বাগেরহাটের সঙ্গে আরো রয়েছে-

১. কলকাতার 'চায়না টাউন' খ্যাত টেরিবাজার
২. পাকিস্তানের লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি
৩. লিবিয়ার ঐতিহাসিক বেনগাজি শহর
৪. যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামার আফ্রিকা টাউন
৫. টেক্সাসের গার্সিয়া চারণভূমি
৬. যুক্তরাজ্যের হ্যাম্পশায়েরর হার্স্ট কাসেল
৭. লেবাননের বৈরুতের ঐতিহ্যবাহী ভবন
৮. অস্ট্রেলিয়ার কিনচেলা অ্যাবোরিজিনাল বয়েজ ট্রেনিং হোম
৯. ক্যাম্বোডিয়ার মোনদুলকিরি প্রদেশের বুনোং জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপ
১০. চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের ইয়াংতাইয়ের দূর্গ-প্রসাদ
১১. ইন্দোনেশিয়ার সুম্বা দ্বীপ
১২. নেপালের কাঠমান্ডু উপত্যকার হিতিস (বরনা)
১৩. সুলানের নুবি
১৪. বেলিজের ভারতীয় গির্জা গ্রাম- লামানাই
১৫. ব্রাজিলের মন্তে আলেগ্রে স্টেট পার্ক
১৬. বার্কিনা ফাসোর উয়াগাদুগুর লা মাইসন দু পিউপিল
১৭. মিসরের আবিদোস
১৮. ঘানার আসান্তে ঐতিহ্যবাহী ভবন
১৯. মালদ্বীপের কোয়াগানু মসজিদ ও সমাধিক্ষেত্র
২০. মেক্সিকোর সান হুয়ান তিওতিহুয়াকানের তিওতিহুয়াকান
২১. পেরুর মিরাফ্লোরেস জেলার ইয়ানাকানচা-হুয়াকিস সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপ
২২ পর্তুগালের লিসবনের মেরিন স্টেশনের (আলমাদা নেগরেইরোস মুরাল), আলকানতারা অ্যান্ড রোচা দো কোন্দে দে ওবিদোস
২৩. রোমানিয়ার তিমিসোয়ারার ফেব্রিক সিনাগগ ও তিমিসোয়ারার ইহুদি ঐতিহ্য
২৪. ইয়েমেনের সোকোত্রা দ্বীপপুঞ্জ।■

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

নামিরা জাহান, ১০ম শ্রেণি, শেখ আব্দুল আজিজ উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারটেক, ঢাকা

কাঁচা আম

রহমাতুল্লাহ আল আরাবী

গ্রীষ্মের দাবদাহের পরে
আসে বর্ষার নাম
এই ঋতুতেই ফলবে দেখো
হরেক রকম আম।

বোশেখ মাসের ঝড়-বাতাসে
দুপুর কিংবা রাতে,
আম কুড়োনোর ধুম পড়ে যায়
পাড়াপড়শির সাথে।

কাঁচা আমের ভর্তা খেয়ে
জিভে নামে রস,
সে কারণে বাংলাদেশে
আমের এত যশ।

আমের স্বাদটি যায় না ভুলা
কাঁচা কিংবা পাকা,
আম কুড়োনোর লোভেই আমার
গাঁও-গেরামে থাকা।

১০ম শ্রেণি, সিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

বৈশাখ

আথির আলম

আসতে চলেছে ১৪ই
এপ্রিল
নামছে বৈশাখের ঢল।
কত মানুষ বলবে যে,
মেলায় ঘুরতে চল।
যে মেলায় ঘুরতে গেলাম
দেখি
গান বাজে ওই
কাটিবে বৈশাখ মেলায় মেলায়
নাগরদোলা কই?

৫ম শ্রেণি, কালাচাঁদপুর সরকারি মডেল হাই স্কুল, ঢাকা

এল বৈশাখ

সিরাজ সালেহীন

ওই এল বৈশাখ
বাজে ঢোল বাজে ঢাক।
নতুন আশা দিচ্ছে ডাক
দুঃখগুলো মুছে যাক।
ডানা মেলব মাটির টানে
জমবে মেলা কবি-গানে।
সাজবে সবাই রঙিন সাজে
গাইবে গান সুর আর তালে।

৮ম শ্রেণি, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়

মেলা

রুপা আক্তার

খোকা-খুকি সবাই এসেছে
গ্রামের বৈশাখি মেলায়
কেউবা কিনে মাটির পুতুল, কেউবা খেলনা
আবার কেউ উঠে নাগরদোলায়।

দলবেধে ঘুরছে তারা
সারা মেলা জুড়ে
দুই হাত ভরা জিনিস নিয়ে
ফিরছে নিজ নিজ নীড়ে।

৮ম শ্রেণি, বারহাট্টা উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা

খুদে শিক্ষার্থীর বড়ো সাফল্য

যে বয়সে খেলাধুলা-হই হুল্লোড় বা আনন্দ-ফূর্তিতে থাকার কথা, সে বয়সে কম্পিউটারের অর্ধশতাধিক প্রোগ্রাম আয়ত্ত করাসহ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং বিজনেসে নিজেকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। তার নাম সানবীর। সে রাজশাহীর প্যারামাউন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। বাবা কবির হোসাইন ও মা সুরভী হোসাইন। পাবনার ঈশ্বরদীর বাঘইল শহীদপাড়ায় জন্ম নেওয়া এই কিশোরের মাসিক আয় এখন লক্ষাধিক টাকা।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, মালয়েশিয়া, চীন, তুরস্কের মতো দেশের শত শত বায়ার-সেলারের সঙ্গে দক্ষতা দিয়ে বিজনেস কনফারেন্স মিটিং আয়োজন করে যাচ্ছে সানবীর। ভারতীয় কোম্পানি ভ্যাবজন প্রাইভেট লিমিটেড, যুক্তরাষ্ট্রের তোরো ভেঞ্চার এলএসসি, তুরস্কের মেডিকেল কোম্পানি টর্নোস টর্সেনসজসহ বিভিন্ন কোম্পানিতে ঘরে বসে জব করে সে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রতি ভালো লাগা তাকে বিশ্বের অন্যতম কিশোর উদ্যোক্তা হতে সহযোগিতা করেছে। চার শতাধিক ক্রেতা-বিক্রেতার সঙ্গে কাজ করছে সে। ইতোমধ্যেই 'সানবীর ট্রেডিং' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। রয়েছে এ নামেই ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটার। এছাড়াও করপোরেট, ই-কমার্স, ই-লার্নিং, রিয়েল এস্টেট ও রেন্ট-এ-কারসহ স্ট্র্যাটিক ও ডায়নামিক ওয়েবসাইট ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট করে থাকে। দক্ষতা অর্জন করেছে সানবীর।

২০২০ সালের মার্চে করোনার শুরু থেকে যখন স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে, তখন থেকেই ধরেন সানবীর বাবার ট্রেডিং বিজনেসের হাল। বাবার ট্রেডিং বিজনেসের কাজ করতে গিয়ে গুগল সার্চের মাধ্যমে মেইচেউং টেক ট্রেডিং নামে চায়নিজ একটি কোম্পানির সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপর কানাডিয়ান প্রফেসর ওমর লায়লানির হাত ধরে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং বিজনেসে পথচলা শুরু হয় তার। তারপর এখান থেকেই এই বিজনেসের শিক্ষা জীবন শুরু।

তাদের সঙ্গে বিজনেস করার সূত্রপাত মূলত তখন থেকেই হয়। প্রথম থেকেই ব্যাপক সাড়া পায়। এরপর বিক্রি শুরু হয়। আন্তর্জাতিক মানের চার শতাধিক মানুষের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুরু হয় তখন থেকে। প্রায় ২০ থেকে ২৫টি বিশ্বের দামি ব্র্যান্ড আইটেম নিয়ে কাজ করছে সানবীর।■

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

অটিজম আক্রান্ত শিশুদের ধরন সাধারণ শিশুদের থেকে আলাদা হয়। কখনও এই শিশুরাই আবার বিশেষ গুণে পারদর্শী হয়। অটিজমে হলো মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা। অটিজম-এ আক্রান্ত শিশুকে অটিস্টিক শিশু বলে। ২০০৮ সালে জাতিসংঘ ২রা এপ্রিলকে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ঘোষণা করে।

এবছর ১৫তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়। এবারের প্রতিবাদ্য বিষয় –'এমন বিশ্ব গড়ি অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা বিকশিত করি।' গণভবন থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের স্থায়ী আবাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে সরকার। অনুষ্ঠানে তিনি 'বলতে চাই' এবং 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' নামে দুটি অ্যাপস উদ্বোধন করে বলেন, এই অ্যাপস দুটি কথা বলতে সমস্যায় থাকা ব্যক্তিদের কথা বলতে এবং অটিজম চিকিৎসায় সহায়ক হবে।

কিছুদিন পূর্বেও রোগটি নিয়ে আগে অনেকেই সচেতন ছিলেন না। এখন অটিজম সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। অটিজম এমন একটা অবস্থা যেখানে শিশুটির সামাজিক বিকাশ ঠিকমতো হয় না। এ ধরনের শিশুরা অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে পারে না। অন্যদের সঙ্গে ঠিকমতো মিশতেও পারে না। এরা একা একা থাকতে ভালোবাসে। এবং অনেক ক্ষেত্রে এদের কথা বলা শুরু হতে বেশ দেরি হয়। সাধারণত হাত দিয়ে কোনো জিনিস দেখা বা হাসি-কান্নার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের যে ভঙ্গি শিশুদের মধ্যে দেখা যায় অটিজম-এ আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে তা ঠিকমতো দেখা যায় না।

একটি নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি থাকে এবং একই কাজ এরা বারবার করতে থাকে। যেমন, দরজা-জানালা বারবার খোলা বা বন্ধ করা, পানির কল খোলাবন্ধ আবার ইলেকট্রিকের সুইচ অফ-অন করার মতো কাজ। এদের তাকানোর ধরনটা একটু অন্য রকম। এরা সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। এমন কী, নিজের বাবা বা মায়ের চোখের দিকেও এরা চোখ রাখতে পারে না।

এদের বুদ্ধি অন্য শিশুদের মতো হয় না। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের চিন্তাভাবনা এবং কর্মপদ্ধতি সাধারণ শিশুদের থেকে আলাদা হয়। কখনও এরা খুব স্পর্শকাতর হয়। আবার কখনও অটিজম আক্রান্ত শিশুরা বিশেষ গুণে পারদর্শী হয়। কেউ অঙ্কে কেউ বা বিজ্ঞানে সফল হয়। আবার কেউ খুব ভালো গান করতে পারেন। অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি খেলার জগতে সফল হয়েছেন এমন প্রমাণও আছে। এটাও ঠিক পৃথিবী বিখ্যাত অনেক মনীষী আছেন যাঁরা অটিজমে ভুগেছেন।

অটিজম-এর নানা কারণ আছে। এর মধ্যে যেমন জিন ঘটিত কারণ আছে, তেমনই অনেক অসুখ থেকেও অটিজম হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রোমোজমের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণেও এই রোগ হয়। এই রোগের প্রকৃত কারণ নিয়ে এখন অনুসন্ধান চলছে। তবে একটা জিনিস বোঝা গিয়েছে তা হলো আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন কোষের পারস্পরিক সংযোগ কমে যাওয়া অথবা স্নায়ু থেকে নিঃসৃত কিছু রাসায়নিক পদার্থের অভাব ইত্যাদির কারণেও এই রোগ হতে পারে।

বর্তমানে দেখা যায়, শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের কোনো অসুখ করলে অথবা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তার শারীরিক অবস্থার কোনো ত্রুটি থাকলে মস্তিষ্কের উপরে চাপ পড়ে ফলে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তিত হতে পারে। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের আশপাশে কোনো বিশেষ শিশু থাকলে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করবে।■

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

অনলাইনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানাতে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এটি শুধু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নয় মুক্তিযুদ্ধের তথ্যভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত এবং পরিচিত। রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও -এ অবস্থিত জাদুঘরটির পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথার নানা ইতিহাস। তোমরা যদি সশরীর যেতে না পারো তাহলে www.liberationwarmuseumbd.org ঠিকানায় প্রবেশ করে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকেই ঘুরে আসতে পারবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলেই চোখের সামনে ভেসে আসবে মুক্তিযুদ্ধের তথ্যভাণ্ডার। ওয়েবসাইটের শুরুতেই চারটি ছবিতে যুদ্ধের ময়দানে থাকা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি ও বিদেশি গণমাধ্যমে দেশের শরণার্থীদের করুণ কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনার তথ্য জানা যাবে এ পেজ থেকে।

অনলাইনে জাদুঘরে প্রবেশ করে যে তথ্য জানা বা দেখা যাবে, তা তুলে ধরা হয়েছে 'অ্যাবাউট মিউজিয়াম' অপশনে। এই অংশে ক্লিক করলেই ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের নাম-পরিচয় জানার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যাবে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন বইয়ের তালিকা প্রচ্ছদসহ দেখা যাবে। জাদুঘরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিচালিত প্রোগ্রামের তথ্যও মিলবে। ওয়েবসাইটের বাংলাদেশ অপশনে তুলে ধরা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেওয়া সেক্টর কমান্ডারদের নাম ও যুদ্ধের ময়দানে তাঁদের সাফল্যের ইতিহাস।

এ সাইডে সবচেয়ে সমৃদ্ধ অপশন হলো আর্কাইভ। আর্কাইভে সবার ওপরে রয়েছে 'টুডে ৭১'। এখানে আছে ১৯৭১ সালের দিনভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা। এছাড়া ডকুমেন্টস বিভাগ। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশিত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। রয়েছে গণহত্যা ও নৃশংসতার তথ্য ও 'ফটো আর্কাইভ' অপশনে প্রবেশ করলে দেখা যাবে মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ ছবি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সবার কাছে তুলে ধরতে বছর জুড়েই বিভিন্ন আয়োজন করে থাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। 'অ্যাক্টিভিটিজ' অপশনে প্রবেশ করে এসব তথ্য জানার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরো কি হবে সেসব কার্যক্রম সম্পর্কেও জানা যাবে।■

প্রতিবেদন : এস এম জামান

দ-শ-দি-গ-ন্ত

১৮০টিরও বেশি কবিতা মুখস্থ

বিরল প্রতিভার অধিকারী ছোট্ট বন্ধু জান্নাতুল মাওয়া। বয়স মাত্র পাঁচ বছর। এই বয়সেই তার মুখস্থ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা-আন্দোলনসহ সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ১৮০টিরও বেশি কবিতা মুখস্থ তার। সেই সাথে আবৃত্তিও করতে পারে সে। মাওয়া নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে পারে। নাচ কারাতেও পারদর্শী। তবে তার সবকিছুতেই জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। বিস্ময় বালিকা জান্নাতুল মাওয়ার বাড়ি রংপুরে। রংপুর মিলেনিয়াম স্টার্স স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী সে। ইতোমধ্যেই মাওয়া তার প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছে আর অর্জন করেছে বেশ কিছু পুরস্কার। জান্নাতুল মাওয়ার ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামনে বসে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শোনানো।

গ্রামের নাম ইউটিউব

ইউটিউব থেকে আয়ের মাধ্যমে পাল্টে গেছে একটি গ্রামের চিত্র। কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে এমনটা সম্ভব হয়েছে মামা-ভাগনের বদৌলতে। তারা ইউটিউব চ্যানেলের রান্নায় কনটেন্টে খাবার রান্না করে বিনামূল্যে তা খাওয়ান গ্রামের দরিদ্র মানুষদের। পাশাপাশি ইউটিউবের আয়ের টাকা থেকে গ্রামের অসহায় মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। তাই মানুষের মুখে মুখে এখন গ্রামটির নাম হয়ে গেছে ইউটিউব গ্রাম। ২০১৬ সালে পিকনিক করার সময় বিষয়টি মাথায় আসে কুষ্টিয়ার খোকসার শিমুলিয়ার প্রকৌশলী লিটন আলি খান এবং তার মামা স্কুল শিক্ষক দেলোয়ার হোসেনের। এরপর তারা ইউটিউবে AroundMeBD নামে একটি চ্যানেল তৈরি করেন। প্রথমে ছোটো পরিসরে বাজার ও রান্না করে কিছু মানুষকে খাওয়ানো হয়। বাজার করা, রান্না, খাওয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপের ভিডিও ধারণ করে তা ইউটিউব চ্যানেলে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রথম ভিডিওতেই সাড়া পড়ে যায় ইউটিউব দুনিয়ায়। তাই এই ইউটিউব গ্রামটি এখন খোকসাবাসীর গর্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কয়েন জমিয়ে শখের বাইক

কথায় আছে, শখের তোলা লাখ টাকা। ভারতের তামিলনাড়ুর ভি ভূপাথি নামের এক যুবক নিজের জমানো কয়েনে মোটরসাইকেল কিনেছে। তিনি মোটরসাইকেল কিনতে গিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর একটি শোরুমে। মোটরসাইকেল পছন্দ হলে তার দাম দুই লাখ ৬০ হাজার রুপির পুরোটাই তিনি এক রুপির মুদ্রা দিয়ে পরিশোধ করেন। শখের মোটরসাইকেল কিনতে টানা তিন বছর ধরে মুদ্রা জমিয়েছেন। মোটরসাইকেল কেনার পর যখন মূল্য পরিশোধের সময় আসে তখন এই শোরুমের বিক্রয়কর্মী হতবাক হয়ে যায়। যেহেতু সচল মুদ্রা যে কেউ নিতে বাধ্য তাই ঐ শোরুমের ৫ জন কর্মী ও ভি ভূপাথির ৪ জন বন্ধু মিলে এসব মুদ্রা গুণতে বসে। টানা ১০ ঘণ্টায় তারা দুই লাখ ৬০ হাজারটি মুদ্রা গুণে শেষ করেন। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে শখের মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরেন ভি ভূপাথি।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শান্তুমা খানম নিথী, ৬ষ্ঠ শ্রেণির, বোয়ালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর

মীর্জা মাহের আসেফ, ৫ম শ্রেণির, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি:

১.ইউরোপের একটি দেশ, ৩.ঔষধ, ৫.বিবরণ, ৭.বংশানু, ৯.বরফ, ১০.একটি প্রত্যঙ্গ, ১১. প্রস্থান, ১৩. সিলেট বিভাগের একটি জেলা

উপর-নিচ:

১.জাতিসংঘের একটি দাপ্তরিক ভাষা, ২.রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা, ৪.সাদা, ৬.ঢাকা বিভাগের একটি জেলা, ৮.অভিনবত্ব, ১২.অন্ধ

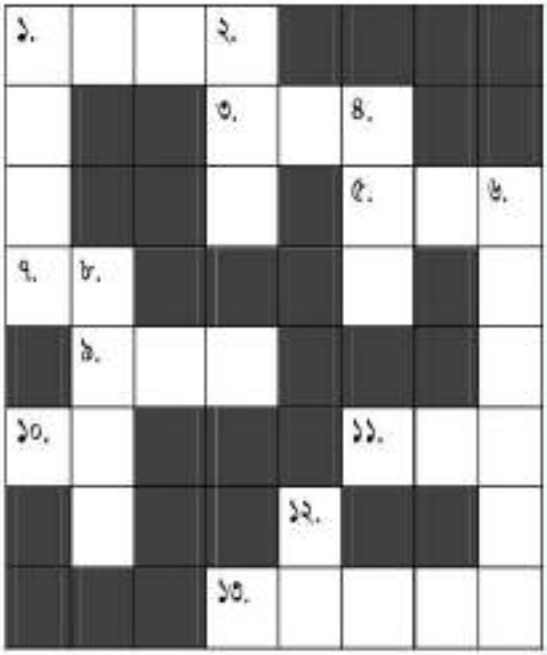

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হল।

সংকেত: নাঈম হাসান, সমাবর্তন, পদ, বিকাশ, সাকিব আল হাসান, বেদনা, বানর, বিনয়, পোকা

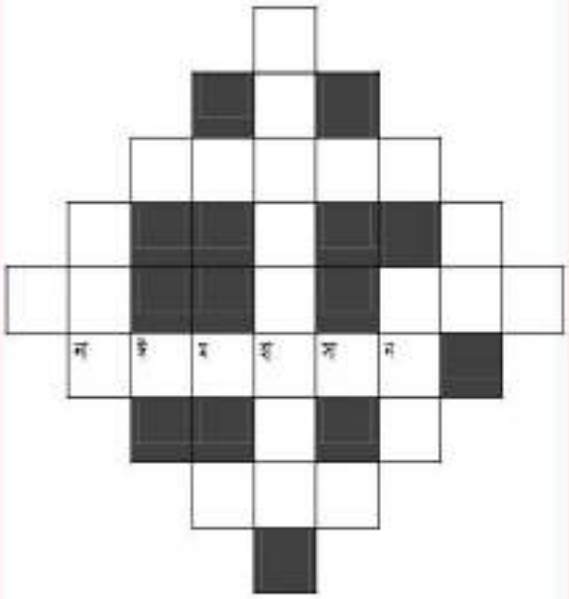

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

২৫		২৯		৬৩		৭৭		৭৫
	২৭						৮১	
২৩			৩২			৭৯		
২০		৩৪			৬৭		৬৯	
	১৮		৩৬	৫৯		৫৭		৭১
১৬		৩৮		৪০			৫১	৫০
১৫				১১		৫৫		
	৫		৭				৫৩	
৩		১		৯	৪৪			৪৭

ব্রেইন ইকুয়েশন

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৭	+		-	৬	=	
-		*		*		*
	*	২	+		=	৫
+		-		-		-
৪	*		-	২	=	
=		=		=		=
	+	৫	+		=	১৮

মার্চ মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

■	■	আ	■	নূ	■	অ	■
স্বা	ধী	ন	তা	পু	র	স্কা	র
■	■	পু	■	র	■	র	■
■	■	রা	■	■	■	■	■
■	■	■	কা	■	গ	ঠ	ন
মু	জি	ব	ন	গ	র	■	■
খ	■	■	ন	■	জ	ঙ্গ	ল
রা	■	■	■	■	■	■	■

ছক মিলাও

				মু				
			■	জি	■			
		স	জী	ব	তা	■		
	■	হ	■	ন	■	■	ক	
কা	ম	ন	■	গ	গ	ন	চু	ম্বী
	■	শী	■	র	■	খ	■	
		ল	ক্ষ	■	ধা	র		
			ত	খ	ন			
				না				

নাম্বারিঙ্ক

৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৩৪	৩৩	২৪	২৩
৬৮	৭৯	৮০	৮১	৭৪	৩৫	৩২	২৫	২২
৬৭	৭৮	৭৭	৭৬	৭৫	৩৬	৩১	২৬	২১
৬৬	৬৩	৬২	৬১	৬০	৩৭	৩০	২৭	২০
৬৫	৬৪	৫৭	৫৮	৫৯	৩৮	২৯	২৮	১৯
৫৪	৫৫	৫৬	৪১	৪০	৩৯	১৬	১৭	১৮
৫৩	৫২	৫১	৪২	১৩	১৪	১৫	৮	৭
৪৮	৪৯	৫০	৪৩	১২	১১	১০	৯	৬
৪৭	৪৬	৪৫	৪৪	১	২	৩	৪	৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

৬	*	২	-	৪	=	৮
/	■	+	■	+	■	*
৩	*	১	-	২	=	১
+	■	*	■	-	■	+
২	*	৪	-	৫	=	৩
=	■	=	■	=	■	=
৪	+	৬	+	১	=	১১

নবারুণ
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
মোবাইল অ্যাপস-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপস
ডাউনলোড করুন।
নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা চিঠি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd
অ্যাডহক প্রকাশনা
বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
www.dfp.gov.bd
করোনার বিস্তার প্রতিরোধে
নো মাস্ক নো সার্ভিস
মাস্ক নাই তো সেবাও নাই
মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-46, No-10, April 2022, Tk-20.00

আফিফা মাইমুনা লাবিবা, ৯ম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা